মীনপোষ

ডিসেম্বর-২০১৫

দুই বাংলার মাছ চাষ

West Bengal
Professional Fisheries
Graduates' Association

Published by WBPFGA
Faculty of Fishery Sciences,
5, Buderhut Road, Chakgaria
P.O.- Panchasayar, Kol-94

প্রচ্ছদ : বাংলার বিখ্যাত পট, শানোয়ার চিত্রকর,
নয়াগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ

প্রচ্ছদের ছবি : মোনালী রায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে

অলঙ্করন : কিরণাংশু শেখর বাগ

সভাপতি : ডঃ নারায়ন বাগ

সাধারণ সম্পাদক : দেবাশীষ হালদার

পরিকল্পনা ও রূপায়নে : চমক মজুমদার

মুদ্রণে : টিঙ্কু প্রেস
৬৩এ/২, হরি ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন : ৯৮৩৬৮২০৭৮৮

প্রকাশ : ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৫

দাম : ২০ টাকা

সম্পাদকীয়

একই ভাষা। একই পরিধান। দুটো ভূখণ্ড। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ। দুই ভূখণ্ডের মানুষেরই অন্যতম মূল গ্রামীণ অর্থনৈতিক ভিত্তি মৎস্যচাষ। মৎস্য আহরণ থেকে মৎস্যজীবী মানুষের উত্তরণ মৎস্যবিজ্ঞানের হাত ধরেই। মৎস্যবিজ্ঞান, বিজ্ঞানের নবতম আঙ্গিক। দুই দেশেই তার নবীন পদক্ষেপ। তবু পারস্পরিক আদান প্রদানই এই বিজ্ঞানকে আলোকময় করতে পারে। উৎকর্ষ, উন্নয়ন, উৎপাদন-এই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলুক দুই দেশের মৎস্য বিজ্ঞান।

সেই লক্ষ্যেই হাত মিলিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যবিজ্ঞান স্নাতকদের একমাত্র সংগঠন WBPFGA। দেশ জাতির সীমা ছাড়িয়ে বিজ্ঞানের উৎকর্ষতাই হোক এই মেলবন্ধনের অভিপ্রায়।

২৬ ডিসেম্বর, ২০১৫
কলকাতা

RMB Power Projects Pvt Ltd.

Living Organism

Cell	+91 8336921258
Phone	+91 3323230091
Fax	+91 3323230092
Mail	md@rmbsolar.com
Web	www.rmbsolar.com
Add	RMB House, P-70, Udayan Industrial Estate 3, Pagladanga Road Kolkata-700 015

বাংলাদেশে মৎস্যচাষ ঃ সাম্প্রতিক অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ করণীয়

প্রফেসর ড. মোহা আখতার হোসেন
ফিশারীজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

বিশ্বব্যাপী দ্রুত প্রসার খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে মৎস্যচাষ অন্যতম। বাংলাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বিধান, আয়বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি মানুষের জীবনমান উন্নয়নে মাছ চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। নানা কারণে জলাশয় সমূহ থেকে প্রাকৃতিকভাবে আহরণকৃত মাছের প্রাপ্যতা কমে যাওয়ায় মাছের উৎপাদন এখন চাষ নির্ভর হয়ে পড়েছে এবং মোট মৎস্য উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশি আসে চাষের মাধ্যমে। চাষকৃত প্রজাতির মধ্যে রুই জাতীয় মৎস্য প্রজাতির প্রাধান্য ছাড়াও পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, চিংড়ি, দেশী শিং, মাগুর ইত্যাদির বিস্তার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাছ চাষের উন্নয়ন ও প্রসারে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে চাষী বা উদ্যোক্তা পর্যায়ে চাষযোগ্য প্রজাতির বৈচিত্র্যতা সহ চাষের ইনটেনসিটি ও বিভিন্ন ধরণের জলাশয়ের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাষ প্রযুক্তি ও সম্প্রসারণ কৌশলের উন্নয়নে দেশে চাহিদার কাছাকাছি মৎস্য উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। অধিকন্তু বিশেষ সতর্কতামূলক পদক্ষেপের কারণে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও সংরক্ষণে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক বাজারে স্বাস্থ্যসম্মত, মাননিয়ন্ত্রিত ও পরিবেশবান্ধব মাছ চাষের দাবি ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে উন্নত চাষ প্রযুক্তির প্রয়োগে হেক্টর প্রতি নিরাপদ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি সময়ের দাবি। কিন্তু ক্রমবর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, খাদ্য উৎপাদনের জন্য পরিবেশজনিত সঙ্কটাপন্ন অঞ্চল এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব-এই সমস্ত দিকসমূহের বিবেচনায় মৎস্যসম্পদ সহ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক নীতি ও উন্নয়ন চাহিদার আলোকে প্রযুক্তি নির্ভর চাষ পদ্ধতি সমূহের সাম্প্রতিক অগ্রগতি বিশ্লেষণ, মৎস্যচাষের ভবিষ্যত উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাসমূহ উত্তরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অতীব জরুরী।

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক নীতি ও উন্নয়ন চাহিদা

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের সামগ্রিক উন্নতিকল্পে 'জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮' প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় মৎস্য নীতির উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে অন্যতম হলো ঃ মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি; আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্র বিমোচন ও মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ। 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'য় ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জিতব্য অন্যতম লক্ষ্যমাত্রাসমূহ হচ্ছে- দারিদ্র বিমোচন ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ। এ দেশের 'রূপকল্প-২০২১' এর আলোকে ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জিতব্য অন্যতম লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি। দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাদের নিজস্ব পুকুর নেই, খাস পুকুর ও খাঁড়ি, বিল, প্লাবনভূমি এবং নদীতে মাছচাষের সুযোগ দিয়ে তাঁদের কর্মস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা সম্ভব।

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য উৎপাদন

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য সম্পদের (সারণী-১) গুরুত্ব অপরিসীম। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণ ও বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক মৎস্য সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে (তথ্যসূত্র-১)। বিশেষতঃ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রতি ৫ জনের মধ্যে ৪ জনই কোনো না কোনো ভাবে মৎস্য উৎপাদন বা আহরণ বা বিতরণ বা বিক্রয় বা উপকরণ সরবরাহ বা পোনা পরিবহণ বা প্রক্রিয়াজাতকরণ বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজের সাথে জড়িত (তথ্যসূত্র-২)। গ্রহণকৃত প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশই আসে মাছ থেকে। দেশের মোট জিডিপি'র ৩.৬৯ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি'র প্রায় এক চতুর্থাংশ (২২.৬০ শতাংশ) মৎস্যখাতের অবদান। দেশের রপ্তানি আয়ের ২ শতাংশের অধিক আসে মৎস্যখাত হতে (তথ্যসূত্র-১)।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের (নদী, বিল ও প্লাবনভূমি, কাপ্তাই লেক, সুন্দরবন) পরিমাণ প্রায় ৩৯ লক্ষ ১০ হাজার হেক্টর, বদ্ধ জলাশয়ের (পুকুর, মৌসুমী চাষকৃত জলাশয়, বাঁওড় ও চিংড়ি ঘের) পরিমাণ ৭ লক্ষ ৮৯ হাজার হেক্টর, সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিমি এবং সমুদ্র উপকূল রয়েছে ৭১০ কিমি (সারণী-১)। বাংলাদেশে শতকরা ৮০ ভাগেরও অধিক মৎস্য উৎপাদিত হয় অভ্যন্তরীণ জলাশয় হতে; আবার অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মধ্যে পুকুর-দিঘির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা সবচেয়ে বেশি। দেশে মাছের মোট উৎপাদনে মুক্ত জলাশয়ের অবদান মাত্র ২৮.০৭ শতাংশ, অন্যদিকে বদ্ধ জলাশয়ের অবদান ৫৫.১৫ শতাংশ (সারণী-২)।

মুক্ত জলাশয়ে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রবৃদ্ধি কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হয়নি। বিল নার্সারি স্থাপন, পোনা অবমুক্তি, মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা, খাল পুনঃখনন, মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন প্রভৃতি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের পরও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন সীমিত। অন্যদিকে চাষি প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর, লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রমে চাষকৃত মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে। বিগত ১০ অর্থবছরে (২০০৪-০৫ হতে ২০১৩-১৪) মৎস্য উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায় গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.৩৮ শতাংশ (সারণী-৩)। বাংলাদেশের জনগণ সামুদ্রিক মাছ অপেক্ষা স্বাদু পানি এবং উপকূলীয় মাছ বেশী পছন্দ করে তাই স্বাদু পানির মাছ ও চিংড়ি আহরণের পরিমাণ বেশী। অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ১০টি প্রজাতি হলো ঃ পাঙ্গাস, রুই, তেলাপিয়া, সিলভার কার্প, কাতলা, মৃগেল, ইলিশ, চিংড়ি, কমন কার্প ও বোয়াল/আইর (সারণী-৪)। জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান, আপৎকালীন খাদ্য সহায়তা এবং ভরা প্রজনন মৌসুমে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে ইলিশের প্রাপ্যতা ও প্রবৃদ্ধি কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণী-৫)। অন্যদিকে চাহিদার তুলনায় কম হলেও রপ্তানিমুখী পণ্য, চিংড়ির উৎপাদন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে (সারণী-৬)।

সারণী-১ ঃ বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ সম্পর্কিত তথ্য কণিকা (২০১৩-১৪)
(তথ্যসূত্র-১)

	অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ		
	ক. বদ্ধ জলাশয়	:	৭৮৯৩৪১ হেক্টর
	পুকুর	:	৩৭১৩০৯ হেক্টর
	বাঁওড়	:	৫৪৮৮ হেক্টর
	চিংড়ি খামার	:	২৭৫২৭৪ হেক্টর
	পেন কালচার	:	৬৭৭৫ হেক্টর
	খাঁচায় মাছ চাষ	:	৭ হেক্টর
	মৌসুমি জলাশয়	:	১৩০৪৮৮ হেক্টর
১.	**খ. উন্মুক্ত জলাশয়**	:	৩৯১০০৫৩ হেক্টর
	নদী ও মোহনা	:	৮৫৩৮৬৩ হেক্টর
	সুন্দরবন	:	১৭৭৭০০ হেক্টর
	বিল	:	১১৪১৬১ হেক্টর
	কাপ্তাই লেক	:	৬৮৮০০ হেক্টর
	প্লাবনভূমি	:	২৬৯৫৫২৯ হেক্টর

	গ. সামুদ্রিক জলসম্পদ		
	সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ	:	১১৮৮১৩ বর্গকিমি
	উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃতি	:	৭১০ কিলোমিটার
২.	**মৎস্য উৎপাদন ও মূল্যমান**		
	মৎস্য উৎপাদন	:	৩৫৪৮১১৫ মে. টন
	উৎপাদিত মাছের বর্তমান বাজার মূল্য	:	৫৩৩১৬ কোটি টাকা
৩.	**মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি**		
	রপ্তানির পরিমান	:	৭৭৩২৮ মে. টন
	রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন	:	৪৮৯৮.২২ কোটি টাকা
	মোট রপ্তানিতে মৎস্য খাতের অবদান	:	২.০১%
৪.	**জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান**		
	জাতীয় জিডিপি'তে অবদান	:	৩.৬৯%
	কৃষিজ জিডিপি'তে অবদান	:	২২.৬০%
৫.	**জনপ্রতি মাছ গ্রহণ ও চাহিদা**		
	জনপ্রতি বার্ষিক মাছ গ্রহণ	:	১৯.৩০ কেজি
	জনপ্রতি মাছের বার্ষিক চাহিদা	:	২১.৯০ কেজি
	জনপ্রতি মাছের দৈনিক চাহিদা	:	৬০ গ্রাম
	প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে অবদান (প্রায়)	:	৬০%
৬.	**মৎস্য/চিংড়ি চাষি ও জেলে**		
	মৎস্য ও চিংড়ি চাষে সম্পৃক্ত চাষি (অনুমিত)	:	৪০.০০ লক্ষ
	জেলের সংখ্যা (অনুমিত)	:	২০.০০ লক্ষ
৭.	**উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকায় মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম**		
	বাণিজ্যিক ট্রলার	:	১৮৪ টি
	ইঞ্জিন চালিত নৌকা	:	৩২৮৫৯ টি
	ইঞ্জিন বিহীন নৌকা	:	৩৪৮০১ টি
	মাছ ধরার জাল ও বঁড়শি	:	৮১৩৭৭৭ টি
৮.	**মৎস্য প্রজাতি (সংখ্যা)**		
	মিঠা পানির মৎস্য প্রজাতি	:	২৬০ টি
	বিদেশি মৎস্য প্রজাতি	:	১২ টি
	মিঠা পানির চিংড়ি	:	২৪ টি
	সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি	:	৪৭৫ টি
	সামুদ্রিক চিংড়ি প্রজাতি	:	৩৬ টি

৯.	**মৎস্য হ্যাচারি ও উৎপাদন**		
	সরকারি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারের সংখ্যা (৭৬টি হ্যাচারি সুবিধাসহ)	:	১৩৬ টি
	বেসরকারি হ্যাচারির সংখ্যা	:	৯০৩ টি
	সরকারি হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন (২০১৪)	:	১০৩৩৮ কেজি
	বেসরকারি হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন (২০১৪)	:	৪৭৮৯৯৩ কেজি
	গলদা হ্যাচারি (সরকারি ১১ টি সহ)	:	২৭ টি
	বাগদা হ্যাচারি (সরকারি ৮টি সহ)	:	৫৫ টি
	গলদা হ্যাচারিতে পি এল উৎপাদন (সরকারিসহ)	:	২.৭০ কোটি
	বাগদা হ্যাচারিতে পি এল উৎপাদন (সরকারিসহ)	:	৯৫৫.০০ কোটি
১০.	**মানব সম্পদ উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো**		
	মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমী	:	০১ টি
	মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	:	০৬ টি
	মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট (নির্মাণাধীন ৩টিসহ)	:	০৪ টি
১১.	**মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল**	:	৫৭৮৬

সারণী-২ : বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন (২০১৩-১৪) (তথ্যসূত্র-১)

মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্র	জলায়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (মে.টন)	শতকরা অংশ(%)	উৎপাদন হার (কেজি/হেক্টর)
ক. অভ্যন্তরীণ জলাশয়				
১. মুক্ত জলাশয়				
(১) নদী ও মোহনা	৮৫৩,৮৬৩	১৬৭৩৭৩	৪.৭২	১৯৬
(২) সুন্দরবন	১৭৭৭০০	১৮৩৬৬	০.৫২	১০৩
(৩) বিল	১১৪১৬১	৮৮৯১১	২.৫১	৭৭৯
(৪) কাপ্তাই লেক	৬৮৮০০	৮১৭৯	০.২৩	১১৯
(৫) প্লাবনভূমি	২৬৯৫৫২৯	৭১২৯৭৬	২০.০৯	২৬৫
উপমোট	৩৯১০০৫৩	৯৯৫৮০৫	২৮.০৭	

মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্র	জলায়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (মে.টন)	শতকরা অংশ(%)	উৎপাদন হার (কেজি/হেক্টর)
২. বদ্ধ জলাশয়				
(৬) পুকুর	৩৭১৩০৯	১৫২৬১৬০	৪৩.০১	৪১১০
(৭) মৌসুমি চাষ জলাশয়	১৩০৪৮৮	১৯৩৩০৩	৫.৪৫	১৪৮১
(৮) বাঁওড়	৫৪৮৮	৬৫১৪	০.১৮	১১৮৭
(৯) চিংড়ি খামার	২৭৫২৭৪	২১৬৪৪৭	৬.১০	৭৮৬
(১০) পেন কালচার	৬৭৭৫	১৩০৫৪	০.৩৭	১৯২৭
(১১) খাঁচায় মাছচাষ	৭	১৪৪৭	০.০৪	২২ কেজি/ ঘঃমিঃ
উপমোট	৭৮৯৩৪১	১৯৫৬৯২৫	৫৫.১৫	
মোট অভ্যন্তরীণ জলাশয়	**৪৬৯৯৩৯৪**	**২৯৫২৭৩০**	**৮৩.২২**	
খ. সামুদ্রিক জলসম্পদ				
(১২) ট্রল ফিসিং	-	৭৬৮৮৫	২.১৭	-
(১৩) আর্টিসেনাল ফিসিং	-	৫১৮৫০০	১৪.৬১	-
মোট সামুদ্রিক জলাশয়	-	**৫৯৫৩৮৫**	**১৬.৭৮**	-
সর্বমোট	-	**৩৫৪৮১১৫**	**১০০**	-

সারণী-৩ : মৎস্য উৎপাদনের ক্রমধারা (২০০৪-০৫ হতে ২০১৩-১৪) (তথ্যসূত্র-১)

অর্থবছর	২০০৪-০৫	০৫-০৬	০৬-০৭	০৭-০৮	০৮-০৯	০৯-১০	১০-১১	১১-১২	১২-১৩	১৩-১৪
মৎস্য উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)	২২.১৬	২৩.২৯	২৪.৪০	২৫.৬৩	২৭.০১	২৮.৯৯	৩০.৬১	৩২.৬২	৩৪.১০	৩৫.৪৮
বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধি(%)	৫.৪২	৫.০৮	৪.৭৯	৫.০৫	৫.৩৯	৭.৩২	৫.৬০	৬.৫৪	৪.৫৫	৪.০৪

সারণী-৪ : অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ১০টি প্রজাতির অবদান (২০১৩-১৪) (তথ্যসূত্র-১)

ক্রমিক	প্রজাতি	মোট উৎপাদন (মে.টন)	অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনে অবদান %
১.	পাঙ্গাস	৩৭১০৬৮	১২.৫৭
২.	রুই	৩০৩৯৫০	১০.২৯
৩.	তেলাপিয়া	২৯৮০৬২	১০.০৯
৪.	সিলভার কার্প	২১৮৯৮২	৭.৪২
৫.	কাতলা	২১৭৯৩৩	৭.৩৮
৬.	মৃগেল	২০৬৮১২	৭.০০
৭.	ইলিশ	১২৭৫১৪	৪.৩২
৮.	চিংড়ি	১২৪৮৫৬	৪.২৩
৯.	কমন কার্প	১০০৬৭৪	৩.৪১
১০.	বোয়াল/আইর	৮১৫৩৬	২.৭৬

সারণী-৫ : অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক জলাশয়ে ইলিশের উৎপাদন (২০০৪-০৫ হতে ২০১৩-১৪) (তথ্যসূত্র-১)

অর্থবছর	উৎপাদন (মে.টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০০৪-০৫	২৭৫৮৬২	৭.৮৩
২০০৫-০৬	২৭৭১২৩	০.৪৬
২০০৬-০৭	২৭৯১৮৯	০.৭৫
২০০৭-০৮	২৯০০০০	৩.৮৭
২০০৮-০৯	২৯৮৯২১	৩.০৮
২০০৯-১০	৩১৩৩৪২	৪.৮২
২০১০-১১	৩৩৯৮৪৫	৮.৪৬
২০১১-১২	৩৪৬৫১২	১.৯৬
২০১২-১৩	৩৫১২২৩	১.৩৬
২০১৩-১৪	৩৮৫১৪০	৯.৬৬

সারণী-৬ : অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক জলাশয়ে চিংড়ির উৎপাদন (২০০৪-০৫ হতে ২০১৩-১৪) (তথ্যসূত্র-১)

অর্থবছর	উৎপাদন (মে.টন)	চাষকৃত চিংড়ির শতকরা হার
২০০৪-০৫	১৯৫৬৯০	৪২.২৪
২০০৫-০৬	২১১০১০	৪০.৫২
২০০৬-০৭	২২১১৩১	৩৯.২৭
২০০৭-০৮	২২৩০৯৩	৪২.২৩
২০০৮-০৯	২৪৪৯৭২	৪২.০০
২০০৯-১০	১৮৬৮৯২	৪৭.০৭
২০১০-১১	২৩৯৪৬০	৫২.০৫
২০১১-১২	২৫২৫২৩	৫৪.৩২
২০১২-১৩	২৩১৮৪২	৬০.৫০
২০১৩-১৪	২২৩৭৮৮	৫৭.৩৪

মৎস্য চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

মৎস্য খাতের উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করার জন্য 'বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট' একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। গবেষণা কার্যক্রমের দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় এই ইনস্টিটিউট ইতিমধ্যে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ৪৯টি বিষয়ভিত্তিক উন্নত প্রযুক্তি প্যাকেজ উদ্ভাবন করেছে। ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ প্রধান প্রধান প্রযুক্তিসমূহ হলো—রুই জাতীয় মাছের উন্নত নার্সারী ব্যবস্থাপনা, রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ, বিএফআরআই সুপার তেলাপিয়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ, মৎস্য খাদ্য ব্যবস্থাপনা, মাছ ও চিংড়ির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতির প্রজনন, নার্সারি ও চাষ কৌশল, মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ পদ্ধতি, থাই পাঙ্গাসের প্রজনন ও চাষ, গলদা চিংড়ির গৃহাঙ্গন হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন, বাগদা চিংড়ির উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনা; রুই, রাজপুঁটি, কৈ ও তেলাপিয়া মাছের উন্নত জাত উদ্ভাবন, শিং-মাগুর মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ, স্বাদুপানির ঝিনুকে মুক্তো চাষ, ফসল চক্রভিত্তিক বাগদা ও গলদা চিংড়ির চাষ, ইলিশ সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি। কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে ইনস্টিটিউট ৪টি মাছের উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে যথা (১) দেশীয় উন্নত রুই মাছ; (২) বিএফআরআই সুপার গিফট তেলাপিয়া; (৩)

বিএফআরআই রাজপুঁটি ও (৪) কৈ মাছ। মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভবিষ্যৎ প্রধান গবেষণা পরিকল্পনাসমূহ হলো ঃ কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে মাছের উন্নততর জাত উদ্ভাবন; বিপন্ন জলজ প্রজাতিসমূহ সংরক্ষণে জিন ব্যাংক স্থাপন, পোনা উৎপাদন ও চাষ কৌশল উদ্ভাবন; ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও চাষ কৌশল উদ্ভাবন; কাঁকড়া, কুচিয়া, শামুক, ঝিনুকসহ অপ্রচলিত জলজ প্রাণীর প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন; অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি; পরিবেশবান্ধব চিংড়ি ও মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা; সামুদ্রিক মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ ব্যবস্থাপনা।

উল্লেখ্য যে, ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহ মৎস্য অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সরকারি বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশব্যাপী হস্তান্তরিত হয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ সফলতা যেমন পাওয়া গেছে তেমন কিছু সমস্যাও চিহ্নিত হয়েছে। একই প্রযুক্তি দেশের সমগ্র কৃষি পরিবেশিক অঞ্চলের জন্য গ্রহণযোগ্যতা পায়নি এবং একই প্রযুক্তি হস্তান্তরে বিভিন্ন সংস্থার তথ্যেও ব্যাপক ভিন্নতা দেখা যায়।

প্রযুক্তিসমূহের সম্প্রসারণ যেমন কিছু কিছু অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে তেমনি কিছু কিছু গোষ্ঠীও সম্প্রসারণ সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। মাছ চাষের উপযোগী গৃহস্থালী পুকুর, উপযুক্ত কৌশল নির্ধারণপূর্বক বহুমালিকানা বা বর্গাপ্রথার অন্তর্ভুক্ত ধানের জমি এবং পুকুরসমূহে মাছ চাষের মাধ্যমে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর অথবা অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কারিতাস কর্তৃক কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে উত্তর অঞ্চলে দরিদ্র আদিবাসী জনগণ দ্বারা প্রথম বারের মতো মাছ চাষের অভিজ্ঞতায় উৎপাদন ও আয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি না হলেও ৯৮.৬১% আদিবাসী প্রকল্প শেষ হবার পরও মাছচাষ চালিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করে (তথ্যসূত্র-৩)। দেশের যে অঞ্চলে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য চাষ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিস্তার ভাল হয়েছে সে অঞ্চলে জনপ্রতি মৎস্য গ্রহণের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত দুর্যোগের কারণে জনপ্রতি মৎস্য গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে (সারণী-৭)।

সারণী-৭ : অঞ্চলভিত্তিক মৎস্যভক্ষণে মৎস্য প্রকল্প এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (তথ্যসূত্র-৪ ও ৫)

অঞ্চল	বছর	মৎস্য গ্রহণ (গ্রাম/জন/দিন)	মন্তব্য
গ্রামীণ বাংলাদেশ	১৯৮১-৮২	২৩	-
টাঙ্গাইল	১৯৯২	১২	খরা প্রবণ বছর-মৎস্য ভক্ষণ কম হয়েছে।
সিংড়া, নাটোর	১৯৯২	২২	-
ময়মনসিংহ	১৯৯৭		নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠী কর্তৃক মৎস্য ভক্ষণ অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে।
নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী		৩০	
মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠী		৪১	
উচ্চ আয়ের জনগোষ্ঠী		৪১	
কাপাশিয়া, গাজীপুর	১৯৯৮-৯৯		ইকলার্ম ও এম.এ.ই.পি. প্রকল্পের প্রভাবে মৎস্য ভক্ষণ বেশী হয়েছে।
ক্ষুদ্র খামার		৮৩	
মধ্যম খামার		৮৫	
বৃহৎ খামার		৯৬	
দিনাজপুর (আশুরার বিল)	১৯৯৯	৩৪	সি.বি.এফ.এম. প্রকল্পের প্রভাবে মৎস্য ভক্ষণ বেশী হয়েছে।
গোদাগাড়ী, রাজশাহী	২০০৮	২৮	খরা প্রবণ বরেন্দ্র এলাকা-মৎস্য ভক্ষণ অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে।

মৎস্য খাতের উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের প্রধান কার্যসমূহ হলো ঃ বিল নার্সারি স্থাপন ও পরিচালনা, প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, উত্তম মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন, ইলিশসম্পদ ব্যবস্থাপনা, অবক্ষয়িত জলাশয় সংস্কার ও অভয়াশ্রম স্থাপন, প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ, মাছে ফরমালিনের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। বিগত ৫ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে প্রকল্প বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সারণি-৮ এ দেওয়া হলো।

সারণী-৮ : উন্নয়ন খাতে প্রকল্প ও বাস্তবায়ন (২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)

(তথ্যসূত্র-১)

অর্থবছর	প্রকল্প (সংখ্যা)	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)
২০১০-১১	২৩	১৩৫.৪৭	৯৫
২০১১-১২	২৮	১৯৪.১০	১০০
২০১২-১৩	২৭	১৫৩.৩৭	১০০
২০১৩-১৪	২৬	২১৭.৬১	১০০
২০১৪-১৫	২১	৩০৯.০৬	১০০

মৎস্য চাষ পদ্ধতি

পূর্বে বাংলাদেশের মাছ চাষ মূলত পুকুর কেন্দ্রিক রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সম্প্রতি পুকুর ছাড়াও বিভিন্ন জলাশয়ে মৎস্য চাষের বিস্তার হচ্ছে (সারণী-৯)।

একক চাষ

এক্ষেত্রে জলাশয়ে একটি মাত্র প্রজাতির চাষ করা হয়, যেমন-পুকুরে শুধুমাত্র তেলাপিয়া বা গলদা চিংড়ি বা থাই পাঙ্গাস এর চাষ। সাধারণত এই পদ্ধতিতে নিবিড় ব্যবস্থাপনায় বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষ করা হয়।

মিশ্র চাষ

প্রাকৃতিক খাদ্যের পূর্ণ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জলাশয়ে যখন বিভিন্ন স্তরের মাছ একত্রে চাষ করা হয় তখন তাকে মিশ্র চাষ বলে। রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। একক চাষে উচ্চ খাদ্য মূল্যের কারণে সম্প্রতি রুই জাতীয় মাছের সাথে বাজার চাহিদা সম্পন্ন অন্যান্য প্রজাতি যেমন তেলাপিয়া বা শিং বা মাগুর বা গলদা চিংড়ির এমনকি অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ মাছ-মলারও মিশ্র চাষের প্রচলন হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, দেশের কিছু অঞ্চলে বিশেষত উত্তরাঞ্চলে নিরাপদ মৎস্য সরবরাহের নিমিত্তে পুকুরে উদ্যোক্তা পর্যায়ে কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতি (অল্প ঘনত্বে বড় আকারের রুই জাতীয় মাছের চাষ) পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সমন্বিত মাছ চাষ

পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে সর্বাধিক উৎপাদন নিশ্চিতের জন্য যখন একই জমিতে একাধিক ফসল চাষ করা হয় তখন তাকে সমন্বিত মৎস্য চাষ বলে। গৃহপালিত পশু-পাখি, খামারে পালিত জীব-জন্তু, কৃষিজাত ফসল, শাক-সব্জি, রেশম চাষ ও

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার উপজাতের সাথে সমন্বয় সাধন করে মাছ চাষ করা হয়। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশে ধান ক্ষেতে মাছ চাষ পদ্ধতির প্রসার ঘটছে। তাছাড়া স্বল্প খরচে পুষ্টি সরবরাহের নিমিত্তে পুকুর পাড়ে সব্জি চাষে উৎসাহ প্রদানে ইতিমধ্যে কয়েকটি সংস্থান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

প্লাবনভূমিতে মৎস্য চাষ

মনুষ্য সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক নানাবিধ কারণে প্লাবনভূমিতে মৎস্যসম্পদ হারিয়ে যেতে বসেছে। এ অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার গৃহীত কার্যক্রমের ফলে কতিপয় নির্বাচিত প্লাবনভূমিতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রসারণ কার্যক্রমের কারণে প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের বিস্তার ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করাও সম্ভব হয়েছে। প্লাবনভূমির সুফলভোগীদের আয়-রোজগারও বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে নিয়মিত মাছ আহরণ বৃদ্ধি পেয়েছে, স্থানীয়ভাবে মাছের প্রাপ্যতা ও মাছ খাওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজারে নিয়মিত মাছ বিপণনের ফলে বাড়তি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, অতি কম খরচে প্লাবনভূমিতে মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে এবং মাছের জীববৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক প্রজাতির মাছ যা পূর্বে হ্রাস পেয়েছিল তা আবার প্লাবনভূমিতে বর্তমানে ফিরে পাওয়া যাচ্ছে।

খাঁচায় মাছ চাষ

বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত এটি একটি নতুন পদ্ধতি। সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীতে খাঁচায় তেলাপিয়া চাষ ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এটি একদিকে যেমন লাভজনক অন্যদিকে যে সমস্ত চাষির নিজস্ব পুকুর বা জলাশয় নেই তাদের জন্য মাছ চাষের একটি সুবিধাজনক পদ্ধতি।

নদীর কোলে মাছ চাষ (পেন কালচার)

বর্ষা মৌসুমে নদীতে পানি প্রবাহ থাকলেও শুকনো মৌসুমে পানি কমে শুষ্ক বালুচরে পরিণত হয়। নদীর তলদেশে চর পড়ার কারণে কোথাও কোথাও পানি আবদ্ধ হয়ে ছোট লেক বা বড় পুকুরের ন্যায় মৌসুমি জলাশয়ের সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এরূপ আবদ্ধ জলাশয় স্থানীয়ভাবে কোল নামে পরিচিত। সাধারণত কোলে বড় আকরের রুই জাতীয় মাছ মজুদ করা হয়। নদীর কোলে নতুন ভাবে মাছ চাষের সুযোগ প্রাপ্তি অপুষ্টি নিরসনে এক নতুন সম্ভাবনা।

উপকূলীয় মৎস্য চাষ

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ার ভাটা প্রবণ নিচু এলাকায় চিংড়ি চাষ একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসাবে বিবেচিত হয়। দ্রুত প্রসারমান এই শিল্প থেকে অন্যান্য দেশের তুলনায় কম উৎপাদন পাওয়া যায়। রপ্তানীর জন্য কাঁচামাল মূলতঃ চিংড়ি সরবরাহের

অভাবে দেশের প্রক্রিয়াজাত কারখানাসমূহের উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ২০ শতাংশ ব্যবহৃত হচ্ছে (তথ্যসূত্র-২)। আর্ন্তজাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক চিংড়ি খামারে উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, ঘেরের গভীরতা বৃদ্ধি ও পি এল নার্সিং এর মাধ্যমে ঘেরে জুভেনাইল মজুদের বিষয়ে চাষি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে রপ্তানিকৃত মৎস্য সম্পদের মধ্যে চিংড়ির পরেই কাঁকড়ার অবস্থান। বিদেশে কাঁকড়ার প্রচুর চাহিদা থাকায় উপকূলীয় এলাকায় কাঁকড়া চাষ পদ্ধতি ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ এখনো শতভাগ আহরণ নির্ভর। উপকূলীয় জলাশয়ে ইলিশ চাষের সম্ভাবনা থাকলেও উদ্যোগ পর্যাপ্ত নয়।

সারণী-৯ ঃ মৎস্যচাষের উল্লেখযোগ্য প্রজাতি ও চাষ পদ্ধতি

প্রজাতি	চাষের প্রধান ক্ষেত্র	চাষের প্রধান ইনটেনসিটি
কাতলা *(Catla catla)*	পুকুর	সেমি-ইনটেনসিভ
মৃগেল *(Cirrhinus mrigala)*	ঐ	ঐ
রুই *(Labeo rohita)*	ঐ	ঐ
মাগুর *(Clarias batrachus)*	ঐ	সেমি-ইনটেনসিভ ও ইনটেনসিভ
কালিবাউস *(Labeo calbasu)*	ঐ	সেমি-ইনটেনসিভ
শিং *(Heteropneustes fossilis)*	ঐ	ঐ
বিগহেড কার্প *(Arischthys mobilis)*	ঐ	সেমি-ইনটেনসিভ
গ্রাস কার্প *(Ctenopharyngodon idella)*	ঐ	ঐ
কমন কার্প *(Cyprinus carpio var.communis)*	ঐ	ঐ
সিলভার কার্প *(Hypophthalmichthys molitrix)*	ঐ	ঐ
ব্লাক কার্প *(Mylopharyngodon piceus)*	ঐ	ঐ
মিরর কার্প *(Cyprinus carpio var. specularis)*	পুকুর/ধানক্ষেত	ঐ

থাই পাঙ্গাস *(Pangasius pangasius)*	পুকুর	সেমি-ইনটেনসিভ ও ইনটেনসিভ
পাবদা *(Ompok pabda)*	ঐ	সেমি-ইনটেনসিভ
সরপুঁটি *(Barbodes gonionotus)*	পুকুর/ধানক্ষেত	ঐ
তেলাপিয়া *(Oreochromis nilocus)*	পুকুর/ধানক্ষেত খাঁচায় চাষ	সেমি-ইনটেনসিভ ও ইনটেনসিভ
গলদা চিংড়ি *(Macrobrachium rosenbergii)*	পুকুর/ধানক্ষেত	উন্নত এক্সটেনসিভ ও সেমি-ইনটেনসিভ

মৎস্য চাষের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

দেশের বহু জলাশয় (বিশেষ করে খাস পুকুর, খাঁড়ি,বিল/প্লাবনভূমি ইত্যাদি) প্রভাবশালীদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় দরিদ্র/প্রান্তিক জনগোষ্ঠী মাছ চাষের সুযোগ পাচ্ছে না; ভূ-গর্ভস্থ পানির অতিমাত্রায় ব্যবহারে বেশ কিছু জলাশয়ে পানির অভাবে মাছ চাষের অনুপযোগীতা; বর্গা চাষের ক্ষেত্রে মালিক-চাষীর মধ্যে বিদ্যমান চুক্তি বা শর্তের দুর্বলতা (মালিক-চাষীর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী ও আনুষ্ঠানিক চুক্তির অভাবে দরিদ্র/প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বহুমালিকানা/বর্গা প্রথার আওতায় পুকুর বা ধানক্ষেতে মাছ চাষের জন্য সঠিকভাবে সুযোগ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না); সঠিক সময়ে কাঙ্ক্ষিত ও মানসম্পন্ন পোনা প্রাপ্তির অভাব-হ্যাচারী উৎপাদিত পোনার বৃদ্ধি সন্তোষজনক নয়, চাষি/উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রাকৃতিক উৎসের পোনার (বিশেষ করে ইন্ডিয়ান মেজর কার্পের ক্ষেত্রে) উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে; স্বল্পমূল্যের মৎস্য খাদ্যের অভাব; জলবায়ু পরিবর্তন এবং কৃষি পারিবেশিক অঞ্চলের ভিন্নতায় উপযোগী মৎস্য চাষ প্রযুক্তি ও তাঁর বিস্তারের উন্নয়নে পর্যাপ্ত গবেষণার অভাব।

প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের সুপারিশসমূহ

অবক্ষয়িত জলাশয়ের সংস্কার করে মাছ চাষের সুযোগ প্রদানের জন্য বিদ্যমান সরকারী বেসরকারী সমন্বিত উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। বহুমালিকানা/বর্গা/ইজারা প্রথার আওতায় বিভিন্ন জলাশয়ে টেকসই মাছ চাষের জন্য মালিক চাষীর দীর্ঘমেয়াদী আনুষ্ঠানিক চুক্তির প্রয়োজন।

সময়মত মানসম্পন্ন পোনা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানে পর্যাপ্ত ব্রুড ব্যাংক স্থাপনের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে চাষকৃত বিভিন্ন নদীর পোনার

(বিশেষ করে ইন্ডিয়ান মেজর কার্পের ক্ষেত্রে) বৃদ্ধি মূল্যায়নে গবেষণারও প্রয়োজন।

মৎস্য চাষের উন্নয়নে আঞ্চলিকভাবে সম্প্রসারণ প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলনের উপর গুরুত্ব দিয়ে মাঠ পর্যায়ে গবেষণার প্রয়োজন।

জলবায়ু পরিবর্তনকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে গবেষণা কলেবর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। খরা প্রবণ এলাকার উপযোগী মৎস্যচাষ উন্নয়নে গবেষণার প্রয়োজন। উপকূলীয় অঞ্চলে আহরণ-নির্ভর জেলেদের ইলিশ উৎপাদনমুখী করা গেলে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বেকারত্ব ও উৎপাদন হ্রাসের বিপরীতে জেলেদের পুনঃবাসন ও আয়-উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, এক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোলাবরেটিভ গবেষণা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

উপসংহার

কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে মৎস্যচাষই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে যদি বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ উত্তরণে পর্যাপ্ত গবেষণা, প্রযুক্তির উন্নয়ন ও তার বিস্তারে জরুরী পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

তথ্যসূত্র

১. DoF (Department of Fisheries). 2015. National Fish Week 2015 Compendium (in Bangla), Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Bangladesh, 148 p.

২. DoF (Department of Fisheries). 2003. The Future for Fisheries : Economic Performance, Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, and Livestock, Bangladesh, 172 p.

৩. Hossain, M. A. and Galib, S.M. 2008. Fish culture in ponds and rice fields by poor Adivasi households in Northwest and Northern Bangladesh : Performances evaluation and livelihood aspects. Final Report (submitted to BFRF), 52 p.

৪. Roos, N., Wahab, M.A., Hossian, M.A.R and Thilsted, S.H. 2007. Linking human nutrition and fisheries : incorporating micronutrient-dense, small indigenous fish species in carp polyculture production in Bangladesh, Food and Nutrition Bulletin, 28 (2) : 280-293.

৫. Hossain, M.A., Mohsin, A.B.M., Galib, S.M., Alam, R. and Samad, A.O.M.A. 2009. Potentials of Khas (Public) Ponds and haris (Canals) in Barind Tracts : Sustainable Rural Livelihoods in the Face of Climate Change, Bangladesh J. Prog, Sci & Tech. 7(1) : 49-52.

বাংলাদেশে ইলিশ উৎপাদন এবং সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

মো: রফিকুল ইসলাম খান, WorldFish-Bangladesh
ড. মো: আখতার হোসেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
শোভন খান সবুজ, WorldFish-Bangladesh

ইলিশ বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মানুষের খাদ্য তালিকায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করছে শত বছর ধরে। এটি বাংলাদেশের জাতীয় মাছও বটে। বাঙ্গালীর রসনা বিলাশে ইলিশ থাকবে না একথা কি ভাবা যায়! স্বাদে গন্ধে ভরপুর সম্ভাবনাময় রূপালী রংয়ের এ মাছটি নিয়ে ভাবার সময় এখনই। বঙ্গোপসাগরের তীরের ভারত, বাংলাদেশ ও মায়ানমারসহ আরব সাগরের তীরবর্তী দেশ বাহারাইন, কুয়েত, পশ্চিম মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের পাশে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মেকং অববাহিকার ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, চীন সাগরের পাশে চীন ও থাইল্যান্ড এলাকায় মূলতঃ ইলিশের বিচরণ। একমাত্র বাংলাদেশ ব্যতীত সব দেশেই এর উৎপাদন আগের তুলনায় কমে গেছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বর্তমান বিশ্বের মোট ইলিশের ৬৫ শতাংশ বাংলাদেশে, ১৫ শতাংশ ভারতে, ১০ শতাংশ মায়ানমারে এবং বাকিটা অন্যান্য এলাকায় ধরা পড়ে। বাংলাদেশের নদী-সাগরে কেন এর উৎপাদন বাড়ছে এবং ভারতসহ বাকি ১০ দেশে কেন কমছে, তা আজ ভাবার বিষয় (তথ্যসূত্র-২)। বিগত ২০০২ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত দ্বিগুন হয়ে যাওয়া ইলিশের উৎপাদনের দাবীদার বাংলাদেশের এ কৌশল বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো অত্যন্ত কার্যকরী হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের Clupeidae গোত্রের দুই প্রজাতির ইলিশের মধ্যে *Tenualosa ilisha* ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়। মাছটি anadromus পরিব্রাজক

হিসাবে স্বাদুপানি, মোহনা অঞ্চল এবং সমুদ্রে তার জীবনের বিভিন্ন ধাপে বসবাস করে। মূলতঃ বঙ্গোপসাগরেই এর প্রাপ্যতা সবচেয়ে বেশি। তবে ভারত মহাসাগর হয়ে মধ্যপ্রাচ্যেও ইরান উপসাগর এবং লোহিত সাগর পর্যন্ত পরিব্রাজন বিস্তৃত। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলা ভারতের গঙ্গা-মেঘনা অববাহিকা, ভারতের ভাগিরথী-হুগলি, মায়ানমারের নাফ নদীর স্বাদু পানির অতলে এরা পরিব্রাজন করে থাকে (তথ্যসূত্র-৬)।

প্ল্যাংকটন ভোজী পরিব্রাজক মাছটি গ্রীষ্মকালীন সময়ে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর এবং শীতকালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে সাধারণত পূর্ণিমার সময়ে উপরোক্ত নদী অঞ্চলে ডিম দিয়ে থাকে। এজন্য তাকে সমুদ্র থেকে স্বাদুপানির নদী অঞ্চলে পরিব্রাজন করতে হয়। ডিম থেকে লার্ভি হয়ে জুভেনাইল হওয়ার পরে (৮ সেমি) প্রথমত নভেম্বর এবং দ্বিতীয়ত মার্চ মাসের দিকে মোহনার কাছাকাছি সমুদ্রে চলে যায়। এ সময়ে তারা অপেক্ষাকৃত কম গভীর অঞ্চলে বিচরণ করে। তীরবর্তী সামুদ্রিক অঞ্চলে ১৫-২২ সেমি মাছটি বিচরণ করে যৌবন প্রাপ্ত হয় (তথ্যসূত্র-৩ ও ৬)।

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ততা সাধারণত ২২.৪ পিপিটি থেকে ৩৩.৪ পিপিটি হয়ে থাকে এবং মে মাসে সর্বোচ্চ লবণাক্ততা লক্ষ্য করা গেছে (তথ্যসূত্র-৬)। স্বাদুপানি থেকে উচ্চ লবণাক্ত অঞ্চলে জীবনের বিভিন্ন ধাপে পরিব্রাজন করা ইলিশের জীবনেতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রজনন, খাদ্য এবং উপযুক্ত বাসস্থানের জন্য এরা কয়েকশত কিমি পর্যন্ত পরিব্রাজন করে থাকে। অর্থাৎ এ অঞ্চলের ইলিশ বঙ্গোপসাগর হতে হুগলি-ভাগিরথী, গঙ্গা-মেঘনা অববাহিকা এবং নাফ নদী এলাকায় প্রজনন করে এবং পুনরায় বঙ্গোপসাগরে পরিব্রাজন করে পরিপক্কতা অর্জন করে। দৈহিক আকারের ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি মা-ইলিশ ০.১ মিলিয়ন থেকে ২.০ মিলিয়ন পর্যন্ত ডিম ধারণ করে থাকে।

বাংলাদেশে ইলিশ আহরণ

বাংলাদেশে প্রধানত পদ্মা, মেঘনা, ইলিশা, আন্দারমানিক নদী ও তার মোহনা এবং তীরবর্তী সামুদ্রিক এলাকায় বিভিন্ন জালের মধ্যে প্রধানত ফাঁস জালেই বেশি ইলিশ আহরিত হয়ে থাকে। জেলেরা প্রজননের আগের সময়টাকেই, সাধারণত জুলাই অক্টোবর মাসকেই বেশি ইলিশ ধরার জন্য প্রাধান্য দিয়ে থাকে। বছরের অন্যান্য সময়ে এর পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। বাংলাদেশে সরাসরি ৫ লক্ষ জেলে এবং ২৫ লক্ষ লোকের জীবিকার প্রধান উৎস ইলিশ (তথ্যসূত্র-২)। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট উৎপাদনে ইলিশের অবদান ১১ শতাংশ এবং বার্ষিক প্রায় ৩.৮৫ লক্ষ মে. টন. (২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর) ইলিশ উৎপাদিত হয়, যেখানে ২০০০-২০০১ সালে উৎপাদিত হতো ২.২৯ লক্ষ মে. টন। ২০১৩-১৪ সালে এ বৃদ্ধির হার ৯.৬৬ শতাংশ (তথ্যসূত্র-১)।

অর্থবছর	আহরণ (মে.টন)	বৃদ্ধির হার
২০০০-২০০১	২.২৯	৪.৬৪
২০০১-২০০২	২.২০	-৩.৯৭
২০০২-২০০৩	১.৯০	-৭.৭৭
২০০৩-২০০৪	২.৫৫	২৮.৫৪
২০০৪-২০০৫	২.৭৫	৭.৮৩
২০০৫-২০০৬	২.৭৭	০.৪৬
২০০৬-২০০৭	২.৭৯	০.৭৫
২০০৭-২০০৮	২.৯০	৩.৮৭
২০০৮-২০০৯	২.৯৮	৩.০৮
২০০৯-২০১০	৩.১৩	৪.৮২
২০১০-২০১১	৩.৩৯	৮.৪৬
২০১১-২০১২	৩.৪৬	১.৯৬
২০১২-২০১৩	৩.৫১	১.৩৬
২০১৩-২০১৪	৩.৮৫	৯.৬৬

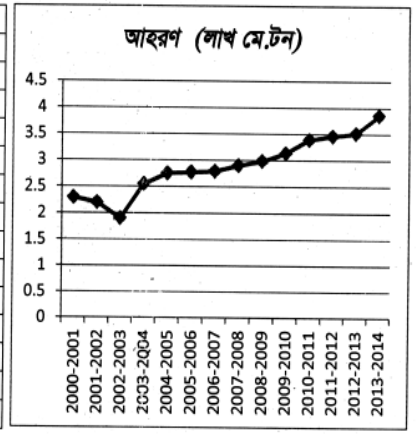

বাংলাদেশে ২০০১-২০১৪ পর্যন্ত ইলিশ উৎপাদনের তথ্যচিত্র (তথ্যসূত্র-১)

বাংলাদেশে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ

খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, গত একদশক পূর্বের ইলিশ উৎপাদন প্রায় নাজুক হয়ে পড়ছিল। সরকারি মৎস্য বিভাগের উদ্যোগ, দাতাদের সহায়তা, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সার্বিক ও সমন্বিত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে ইলিশ বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক ও আশার সঞ্চার করেছে। ২০০১ সন থেকে গৃহীত এসব পদক্ষেপ এবং ব্যবস্থাসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো-

ইলিশ মাছের অবাধ প্রবেশন নিশ্চিত করণের জন্য ৫টি এলাকা চিহ্নিত করে নির্দিষ্ট অভায়শ্রম ঘোষণা করে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

অবাধ প্রজনন ও পোনা উৎপাদনের জন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ এর অধীনে সর্ব্বোচ প্রজনন মৌসুমে প্রধান প্রজনন এলাকায় ১১ দিন ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

অভয়াশ্রম এলাকার কোনো ধরনের বড় ইলিশ মাছ ও জাটকা ধরা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

ইলিশ মাছ আহরণের উপর নির্ভরশীল জেলে সম্প্রদায়কে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে পুনঃবাসিত করে বিকল্প কর্মসংস্থান খুঁজে দেওয়া এবং যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়েছে। নারী-শিশুসহ অতিদরিদ্র জেলে গোষ্ঠীকে আপদকালীন সময়ে বিশেষ জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা।

সরকারি জাটকা সংরক্ষণ আইন এবং প্রজননকালীন সময়ে মা ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গণমাধ্যম, সংবাদপত্র, লিফলেট,

পোস্টার, ফেস্টুনে প্রচার করা হচ্ছে। বিশেষ সময়ে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ এবং ইলিশ সপ্তাহ ঘোষণা করার মাধ্যমে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে ব্যাপক গণসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। একই সাথে সরকারি প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মৎস্য আইনসমূহ বাস্তবায়ন করা যেমন, ইলিশের প্রবেশন চ্যানেল বন্ধ করে তা ধরতে না দেওয়া। ডিমওয়ালা ইলিশ অতি আহরণের কারেন্ট জাল বন্ধ করা, জেল, জরিমানা ইত্যাদি।

উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করে বাংলাদেশ ইলিশ মাছ উৎপাদনে আশার আলো দেখেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০১৪ সালে প্রজনন মৌসুমে ১১ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ থাকায় ১.৬৩ কোটি ইলিশ রক্ষা পেয়েছে। আহরিত ইলিশ থেকে ৪.১৭ লক্ষ কেজি ডিম প্রাকৃতিক ভাবে উৎপাদিত হয়েছে। উৎপাদিত ডিম হতে ৫০ শতাংশ বাঁচার হার ধরলে ২.৬১ কোটি রেণু উৎপাদিত হয়েছে এবং ১০ শতাংশ রেণু বাঁচার হার ধরলে ০.২৬ কোটি পোনা/জাটকা চলতি বছর ইলিশ জনতায় সংযুক্ত হয়েছে বলে ধারণা করা যায় (তথ্যসূত্র-১)।

বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য বিভাগের পরিকল্পনা ও নেতৃত্বে জাতীয় মাছ ইলিশ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত কার্যক্রম ও প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্যে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ, দাতাসংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ, বেসরকারি সংস্থা, জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় জেলে সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। আর্ন্তজাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ডফিশ, ইউএসএআইডি এর আর্থিক সহায়তায় মৎস্য বিভাগের নেতৃত্বে ২০১৪ সাল থেকে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকাসমূহে ECOFISH (Enhanced Coastal Fisheries) প্রকল্পের মাধ্যমে ইলিশসহ উপকূলীয় অন্যান্য মৎস্য প্রজাতিসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে এযাবৎ কালের সর্ব বৃহৎ সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো সরকারি মৎস্য বিভাগকে সহায়তার মাধ্যমে উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে গঙ্গা-মেঘনা অববাহিকাসহ বঙ্গোপসাগরের মোহনা অঞ্চলের ইকোসিস্টেমের টেকসই উন্নয়ন, যার মাধ্যমে জেলে সম্প্রদায়ের জীবিকায়নের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। এ প্রকল্পে ওয়ার্ল্ডফিশ ৮টি সাব পার্টনারের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই গবেষণাসমূহ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উন্নয়ন, জীববৈচিত্র ব্যবস্থাপনা এবং ইকোসিস্টেমের সার্পোটিং পদক্ষেপসমূহকে চিহ্নিত করে ইলিশসহ উপকূলীয় মৎস্য প্রজাতিসমূহের রেজিলেন্ট বৃদ্ধি করে উপকূলীয় দরিদ্র নারী-পুরুষের জীবনযাত্রার টেকসই উন্নয়ন ঘটবে

(তথ্যসূত্র-৪)। এ ছাড়াও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর চাঁদপুর গবেষণা কেন্দ্র এবং WorldFish ইলিশ মাছের জীববৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে বদ্ধ জলাশয়ে এই মাছটির চাষ করা যায় কি না তা নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে। তবে এ ব্যাপারে কতটা সফলতা আসবে তা ভবিষ্যতই বলতে পারে।

উপসংহার

এই অঞ্চলের ইলিশের প্রধান আবাসস্থল বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন বাংলাদেশ ও ভারতের গঙ্গা-মেঘনা, হুগলি-ভাগীরথী, মায়ানমারের নাফ নদীর অববাহিকাসমূহ, যার মধ্যে এই মাছটি প্রধানত পরিব্রাজন করে থাকে। ইলিশ মাছের এই অভিন্ন পরিব্রাজন অঞ্চলটির ইকোসিস্টেমের মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন অভিন্ন বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, যা এই অঞ্চলের ইলিশ মাছসহ অন্যান্য উপকূলীয় মৎস্যকুলের বিচরণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে।

তথ্যসূত্র :

1. DoF (Department of Fisheries), 2015, National Fish Week 2015 Compendium (Bangla). Department of Fisheries, Ministry of Livestock, Bangladesh

2. Mahmud, I. The Daily Prothom Alo, 20th October, 2005 (Bangladesh an example in Hilsha world) Dhaka, Bangladesh

3. Rashid, H. The Daily Prothom Alo, October 2015, (What is the right time? Production of Hilsha). Dhaka, Bangladesh

4. USAID/Bangladesh Enhanced Coastal Fisheries (ECOFISH) Activity concept paper (V4 1 April 2014), WorldFish Bangladesh, H#22B, Road# 7, Block# F, Banani, Dhaka, Bangladesh

5. Ahsan, D.A., Naser, M.N., Bhaumik U., Hazra S. and Bhattcharya, S.B. 2014. Migration, Spawing patterns and Conservation of Hilsha Shad *(Tenualosa ilisha)* in Bangladesh and India. IUCN. Academic Foundation, 4772-73/23 Bharat Ram Road, Darya Ganj, New Delhi-110002 (India)

6. Antony Raja, B.T, October 1985, A Review of the Biology and Fisheries of Hilsha Ilisha in the upper Bay of Bengal, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Marin Fisheries Resource Management in the Bay of Bengal, Colombo, Sri Lanka. C/O, FAO, PO Box 1505, Colombo 7, Sri Lanka.

পশ্চিমবঙ্গের মাছ চাষ ঃ বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ডঃ নারায়ণ বাগ, প্রেসিডেন্ট, ডব্লিউ.বি.পি.এফ.জি.এ

ভূমিকা ঃ মাছে ভাতে বাঙালির পাতে প্রতিদিন অন্তত এক টুকরো মাছ না পড়লে মনের ভেতর কেমন একটা অপূর্ণতা থেকে যায়। সেদিনের ঈশ্বরী পাটনি যদি আজকের দিনে মা অন্নপূর্ণার কাছে বর চাওয়ার সুযোগ পেতেন তবে নিশ্চিতভাবেই বলা চলে তিনি তার বঙ্গ সন্তানকে দুধে ভাতে রাখার থেকে মাছে ভাতে রাখার কথাই বলতেন। আজ থেকে মাত্র কয়েক দশক আগেও সমুদ্র, নদী, নালা, খাল, বিল, ডোবা, পুকুর থেকে শুধুমাত্র মাছ ধরাই চল ছিল - মাছ চাষ সেই অর্থে হত না। ফলে বাজারে মাছের যোগান ছিল অনিয়মিত। অথচ বাঙলার মানুষের বহু দিনের চাহিদাই ছিল প্রতিদিন নিয়ম করে পাতে একটু মাছ। আর তাই দেশের মধ্যে এই বঙ্গভূমিতেই সর্ব প্রথম মাছ নিয়ে গবেষণা, প্রযুক্তি নির্ভর মাছ চাষের বিষয়ে হার্দিক ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছিল। রাজ্যের মাছের চাহিদার কথা মাথায় রেখে ব্রিটিশ সরকার তৎকালীন বঙ্গদেশে ১৯১১ সালে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পৃথক মৎস্য দপ্তর চালু করেন। ১৯৫৭ সালের ১০ই জুলাই বাঙালি বিজ্ঞানী ডঃ হীরালাল চৌধুরীর হাত ধরেই শুরু হয় কার্পের প্রনোদিত প্রজনন। এরপর থেকে মৎস্য প্রিয় বাঙালি প্রকৃতির থেকে মাছের আহরনের উপর আস্থা না রেখে মাছ চাষের উপর গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। ফলে দেশের অন্যান্য বহু রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে মাছ চাষ ও আহরনের ক্ষেত্র অনেক কম হলেও (সারণী ১) গত ২০১০-১১ সাল পর্যন্ত এই রাজ্য মাছ উৎপাদনে দেশের মধ্যে প্রথম ছিল। মাছের চারা উৎপাদনে এবং হেক্টর প্রতি উৎপাদনশীলতায় এখনো দেশের সেরা এই রাজ্য। তবে মনে রাখা দরকার জন প্রতি দিনে মাত্র ৫০ গ্রাম করে মাছের লভ্যতা নিয়ে সন্তুষ্টির সামান্যতম জায়গা নেই। 'প্রতিদিন ১০০ গ্রাম করে মাছ খান আর ডাক্তারখানা এড়িয়ে যান'-এই স্লোগানকে সামনে রেখেই আমাদের এগোতে হবে। অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি রপ্তানিকৃত মাছের পরিমাণও বাড়াতে হবে। তাই সময়ের চাহিদা অনুসারে এই ক্ষেত্রটির দেখভাল করার দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল সংস্থাগুলিকে একযোগে মাছ চাষ বৃদ্ধির সহায়ক নীতি নির্ধারণ ও যথার্থ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবে সেগুলির প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে।

সারণী ১ ঃ ভারতবর্ষ ও মাছ উৎপাদনে দেশের প্রথম ৫টি রাজ্যের মৎস্য সম্পদ ও ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে মোট মাছ উৎপাদন

নাম	চাষযোগ্য জলাশয়ের পরিমান (লক্ষ হেক্টর)	নদী, খাল (কি. মি.)	সমুদ্র তীর (কি. মি.)	মাছ উৎপাদন (লক্ষ টন)
ভারতবর্ষ	৭৩.১২	১৯৫০৯৫	৮১১৮	৯০.৪০
অন্ধ্রপ্রদেশ	৮.১১	১১৫১৪	৯৭৪	১৮.০৮
পশ্চিমবঙ্গ	৫.৪৫	২৫২৬	১৫৮	১৪.৯০
গুজরাট	৪.২৬	৩৮৬৫	১৬০০	৭.৮৮
কেরালা	৫.৪৩	৩০৯২	৫৯০	৬.৭৯
তামিলনাড়ু	৬.৯৩	৭৪২০	১০৭৬	৬.২০

এক নজরে পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য সম্পদ ঃ পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্য্য রয়েছে। এখানে মাছ চাষ ও আহরনের জন্য স্বাদু জল, ঈষৎ নোনা জল, নোনা জল এবং শীতল জল সম্পদ রয়েছে। মাছ ও মাছের অনুসারী কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত রয়েছেন প্রায় ২৯.৫ লক্ষ মানুষ। রাজ্যের নেট স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্টস এ মৎস্য ক্ষেত্রের অবদান ২.৪৪ শতাংশ, কৃষি ও তার সহযোগী ক্ষেত্রগুলির মধ্যে দ্বিতীয়। গত ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে মাছ ও মৎস্যজাত বিভিন্ন দ্রব্য রপ্তানি করে মোট ১৮২৫ কোটি টাকা আয় করা গেছে। এখন একযোগে দেখে নেওয়া যাক পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য সম্পদ, মৎস্য উৎপাদন, এই ক্ষেত্রে অবদান এবং এই ক্ষেত্রের উন্নয়নের সম্প্রসারণ পরিকাঠামো (সারণী ২)।

সারণী ২ ঃ পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য সম্পদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি (২০১২-১৩)

১. সাধারণ তথ্য	অবস্থান	অক্ষ্যাংশ: ২১°৩৮' উত্তর-২৭°১০' উত্তর দ্রাঘিমাংশ: ৮৫°৩৮' পূর্ব-৮৯°৫০' পূর্ব
	আয়তন	৮৮৫৫১ বর্গ কিমি
	মোট জন সংখ্যা (২০১১)	৯.১৪ কোটি
	মৎস্যজীবী গ্রাম	৬৩৪৮টি
	সামুদ্রিক মৎস্যজীবী গ্রাম পঞ্চায়েত	১৮৮ টি

মৎস্যজীবীর সংখ্যা	অভ্যন্তরীণ পুরুষ	১৪৪৬৩৩১
	মহিলা	১১১৯৪৭২
	সামুদ্রিক পুরুষ	২০৩৭৭৪
	মহিলা	১৭৬৩৬৪
	মোট পুরুষ	১৬৫০১০৫
	মোট মহিলা	১২৯৫৮৩৬
	সর্বমোট	২৯৪৫৯৪১
২. অভ্যন্তরীন জলাশয়	**বদ্ধ জলাশয়**	
	পুকুর ও ডোবা	২.৮৮ লক্ষ হেক্টর
	বিল/বাঁওড়	০.৪২ লক্ষ হেক্টর
	ঈষৎ নোনা জলাশয়	০.৬০ লক্ষ হেক্টর
	সুয়েজ ফিসারী	০.০৪ লক্ষ হেক্টর
	মোট	৩.৯৪ লক্ষ হেক্টর
	উন্মুক্ত জলাশয়	
	নদী	১.৬৪ লক্ষ হেক্টর
	নালা	০.৮০ লক্ষ হেক্টর
	জলাধার	০.২৮ লক্ষ হেক্টর
	মোহনা	১.৫০ লক্ষ হেক্টর
	মোট	৪.২২ লক্ষ হেক্টর
৩. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ	ইনসোর	৭৭৭বর্গকিমি
	অফসোর	১৮১৩ বর্গকিমি
	কন্টিনেন্টাল সেল্‌ফ	১৭০৪৯ বর্গকিমি
	উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তার	১৫৮ কিমি
৪. মৎস্য উৎপাদন	**অভ্যন্তরীন**	
	পুকুর ও ডোবা	১০.৬৩৬ লক্ষ টন
	বিল/বাঁওড়	০.৪৮৩ লক্ষ টন
	ঈষৎ নোনা জলাশয়	১.৫৭৫ লক্ষ টন
	সুয়েজ ফিসারী	০.২৪০ লক্ষ টন
	নদী	০.০৪৩ লক্ষ টন
	নালা	০.০২০ লক্ষ টন
	জলাধার	০.০১৬ লক্ষ টন
	ঝোরা	০.০০৪ লক্ষ টন

	অন্যান্য	০.৩৬৩ লক্ষ টন
	মোট	১৩.৩৮ লক্ষ টন
	সামুদ্রিক	১.৫২ লক্ষ টন
	সর্বমোট	১৪.৯০ লক্ষ টন
৫. মাছের চারা উৎপাদন		১৫০০২ মিলিয়ন
৬. চিংড়ির উৎপাদন	**অভ্যন্তরীন**	
	পিনাইড	৭৭৮২০ টন
	নন-পিনাইড	২৩৯০৭ টন
	মোট	১০১৭২৭ টন
	সামুদ্রিক	
	পিনাইড	৭৬৪৩ টন
	নন-পিনাইড	২২৮৪ টন
	মোট	৯৯২৭ টন
	সর্বমোট	১১১৬৫৪ টন
৭. হ্যাচারির সংখ্যা	পোনা মাছের হ্যাচারি	৬০৪ টি
	চিংড়ির হ্যাচারি	১১টি
	মোট	৬১৫ টি
৮. মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি	**কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমিতি**	
	অভ্যন্তরীন	১৮টি
	সামুদ্রিক	২টি
	মোট	২০টি
	প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমিতি	
	অভ্যন্তরীন	৮৩৯টি
	সামুদ্রিক	২৪৩টি
	মোট	১০৮২টি
৯. মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যের রপ্তানি	রপ্তানিকৃত মাছের মোট পরিমান	৬৬৯৪১ টন
	মোট দাম	১৮২৫.১২ কোটি
১০.মাছের লভ্যতা	মোট উৎপাদন	১৪.৯০ লক্ষ টন
	আমদানি	১.১৫ লক্ষ টন
	রপ্তানি	০.৬৭ লক্ষ টন
	মোট লভ্যতা	১৫.৩৮ লক্ষ টন
	জনপ্রতি বার্ষিক মাছ গ্রহণ (আনুমানিক রাজ্যের ৯০% মানুষ মাছ খান)	১৮.৫০ কেজি
	জনপ্রতি দৈনিক মাছ গ্রহণ	৫০ গ্রাম

১১. রাজ্যের অর্থনীতিতে মৎস্য বিভাগের অবদান	নেট স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্টস	৩৩১৪৮৯.৮০
	কৃষি বিভাগের অবদান	৪৬২৪৮.৪৪
	শতকরা হার	১৩.৯৫%
	মৎস্য বিভাগের অবদান	৮০৮৮.৮২
	শতকরা হার	২.৪৪%
১২. মানব সম্পদ উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামো	প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়	১টি
	কেন্দ্রীয় গবেষণাগার	১টি
	কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের শাখা	৩টি
	প্রশিক্ষন ও গবেষণা কেন্দ্র	৫টি
	মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা	১৯টি
	নোনাজলের মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা	৩টি
	কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র	১৮টি
১৩. মৎস্য দপ্তরের কর্মচারীর সংখ্যা	মোট পদের সংখ্যা	২৩১৫টি
	বর্তমানে রয়েছেন	১৪০০ জন (আনুমানিক)

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান চাষ পদ্ধতি ঃ রাজ্যের মাছচাষী/মৎস্যজীবীদের নিরলস প্রয়াস, মৎস্য দপ্তরের উৎসাহ প্রদান, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা কেন্দ্রগুলির পরীক্ষালব্ধ ফলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য উৎপাদন ঊর্দ্ধমুখী। রাজ্যের এলাকাভিত্তিক চাষ পদ্ধতির বৈচিত্রতাও নজর কাড়া। এই মুহূর্তে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যে সকল চাষ পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয় সেগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ নিচে করা হল ঃ-

১. পোনা জাতিয় মাছের মিশ্র চাষ ঃ বহুল প্রচলিত চাষ পদ্ধতি। এক্সটেনসিভ ও সেমি-ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে পুকুরের উৎপাদনশীলতা ও বাজারের চাহিদা অনুযায়ী হেক্টর প্রতি ১০০০০-১৫০০০ চারাপোনা মজুত করা হয়। এই পদ্ধতিতে বছরে ৪ ৬ টন হেক্টর মাছ উৎপাদিত হচ্ছে।

২. পোনা জাতিয় মাছের সঙ্গে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ ঃ পুকুরের উপরের স্তর ও মধ্য স্তরে হেক্টর প্রতি ৫০০০-১০০০০ টি চারাপোনা আর নিম্ন স্তরে ৫০০০-১০০০০ টি ১.৫-২.০ ইঞ্চি সাইজের গলদা চিংড়ি মজুত করে চাষের বিষয়ে মাছচাষীদের মধ্যে ভালো রকমের উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে হেক্টর পিছু বছরে ৩-৫ টন পোনা মাছ ও ২৫০-৫০০ কেজি গলদা চিংড়ি উৎপাদিত হয়।

৩. একাধিক বার মজুতকরন ও আহরনের মাধ্যমে পোনা মাছের মিশ্র চাষ ঃ এই পদ্ধতিতে বছরে হেক্টর প্রতি ২-৩ বার ৭৫০০-১০০০০ টি করে চারাপোনা মজুত করা হয় আর বাজারের চাহিদা অনুসারে মজুত করার ২-৩ মাস পর থেকেই মাছ বিক্রি শুরু হয়ে যায়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ৪০০-৫০০ গ্রামের জ্যান্ত মাছের চাহিদা তুঙ্গে। এই পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি বছরে ৮-১০ টন মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রদর্শনী ক্ষেত্রে এলাকার চাষীদের মধ্যে এই পদ্ধতিতে চাষের জন্য প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৪. গলদা, বাগদা ও ভেনামির একক চাষ ঃ স্বাদু জলে গলদা আর সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় বাগদা ও ভেনামির সেমি-ইনটেনসিভ ও ইনটেনসিভ চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং হেক্টর প্রতি উৎপাদনশীলতা বছরে ৩-৫ টনে উন্নীত হয়েছে। রাজ্য থেকে রপ্তানিকৃত মাছের সিংহভাগই চিংড়ির অবদান।

৫. সুসংহত চাষ ঃ ধান, সব্জি, গৃহপালিত পশু ও পাখির সঙ্গে সুসংহত উপায়ে মাছ চাষের বিষয়ে চাষিদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পদ্ধতিতে একটি খামার থেকে একই সঙ্গে খাদ্যশষ্য, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, সবজি পাওয়ার সুযোগ থাকছে। এই পদ্ধতিতে স্বাদু জলের সর্বোত্তম ব্যবহার যেমন নিশ্চিত হয় তেমনি খামারে ক্ষতির সম্ভাবনাও অনেক কমে যায়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বর্ষার জলকে কাজে লাগিয়ে ধান জমিতে অতি অল্প খরচে প্রচুর মাছ উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমান সেচের সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়ে ভারতীয় বড় পোনা, কাতলা, রুই ও মৃগেল মাছের ইনটেনসিভ চাষ পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি বছরে ১৫ টন উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। পুকুর থেকে মাছের পক্ষে দূষিত জলকে সব্জির বাগানে সারযুক্ত জল হিসাবে ব্যবহার করে সারের খরচ কমানো গেছে।

৬. ভেড়িতে মাছ চাষ ঃ জোয়ারের নোনা জল ও সেই জলের সঙ্গে আসা বিভিন্ন প্রজাতির মাছ বিশেষত বাগদা, পারশে, ভাঙন ইত্যাদিকে ঘিরে নিয়ে মাছের চাষ দুই ২৪ পরগনায় অত্যন্ত জনপ্রিয় চাষ পদ্ধতি।

৭. রঙিন মাছের চাষ ঃ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বহু উৎসাহী চাষি রঙিন মাছের চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, হাওড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় রঙিন মাছের চাষে মহিলাদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো।

৮. তিলাপিয়ার চাষ ঃ একক ও মিশ্র এই দুই পদ্ধতিতেই তিলাপিয়ার চাষ হয়। বর্তমানে মনোসেক্স তিলাপিয়ার চাষ শুরু হয়েছে।

৯. পাঙ্গাস মাছের চাষ ঃ পাঙ্গাস মাছের স্বাদের সঙ্গে এখনো এপার বাংলার মানুষ মিলিয়ে নিতে না পারলেও দ্রুত বৃদ্ধি ও অপেক্ষাকৃত খারাপ পুকুরে ভাল বৃদ্ধি হওয়ায় এই মাছের চাষ জনপ্রিয় হচ্ছে।

১০. ভেটকি মাছের চাষ ঃ সাধারণত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে স্বাদু ও নোনা উভয়ই জলেই ভেটকির একক ও মিশ্রচাষ হয়ে থাকে। মাছটির দ্রুত বৃদ্ধি, বাজারে ভালো চাহিদা ও চড়া দাম থাকায় অনেক মাছচাষি ভেটকি মাছের বিজ্ঞানভিত্তিক চাষে নিয়োজিত হচ্ছেন।

১১. জিয়ল মাছের চাষ ঃ মাগুর, সিঙি, কই মাছের উচ্চ পুষ্টিগুণ, বাজারে ব্যাপক চাহিদা আর ভালো দাম থাকায় জিওল মাছের চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১২. পাবলা ও চিতল মাছের চাষ ঃ উত্তর ও দক্ষিন বঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় পাবদা ও চিতল মাছের একক ও মিশ্র উভয় প্রকার চাষ পরিলক্ষিত হয়।

১৩. ঝোরা ঃ এটি কেবলমাত্র দার্জিলিং জেলায় পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকার মহাশীরের চাষ এই পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। ঝোরা ফিসারীর মাধ্যমে বছরে প্রায় ৪০০ টন মাছ উৎপাদিত হয়।

১৪. পেন ও কেজ কালচার ঃ রিজারভয়ার ও বড় বড় বিল-বাঁওড়ে পরীক্ষামূলকভাবে কার্প, পাঙ্গাস, ভেটকি ইত্যাদির চাষ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হওয়ায় পেন ও কেজের মাধ্যমে মাছ চাষের বিষয়ে মাছচাষিদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে।

১৫. খাদানে মাছ চাষ ঃ কয়লা উত্তোলনের পর যে জলাশয়ের তৈরী হয় তাকে

খাদান বলে। এই সকল খাদানে সরাসরি মাছ চাষ বা কেজের মাধ্যমে মাছ চাষ করে সাফল্য পাওয়া গেছে।

১৬. সিলভার পম্পানোর চাষ ঃ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সরকারি খামারে সিলভার পম্পানোর সফল চাষ রাজ্যের মাছচাষিদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ উচ্চ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন প্রাণীজ প্রোটিনের উৎস হিসাবে, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এবং গ্রামীণ ও শহর এলাকায় লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজের সুযোগ তৈরীর মাধ্যমে রাজ্যের আর্থিক বিকাশের ক্ষেত্রে মাছ চাষের অবদান অনস্বীকার্য (চিত্র ১)। বিভিন্ন সমীক্ষাতে পশ্চিমবঙ্গে আগামী বছরগুলিতে মাছ চাষ, বিপনন ও মাছ সংক্রান্ত বহুবিধ কাজের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার প্রভূত আর্থিক বিকাশের আভাস মিলছে, বাস্তবেও তার প্রতিফলন লক্ষ্যনীয়। গত কয়েক বছরে কলেজ পড়ুয়া ছেলে-মেয়ে থেকে শুরু করে গ্রামের বেকার যুবক-যুবতীদের মধ্যে মাছ চাষের মাধ্যমে স্ব-নির্ভর হওয়ার প্রচেষ্টা ও সাফল্য বেকারত্বের যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে তাদের জীবনে এগিয়ে যাবার পথ দেখাচ্ছে। 'সবার জন্য মাছ আর সব জলাশয়ে চাষ' লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে মৎস্য দপ্তরও তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করছে।

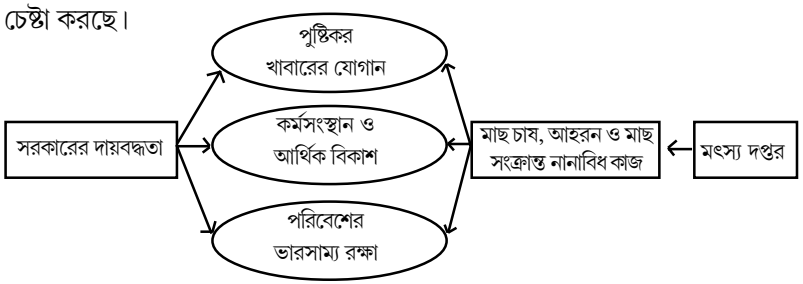

চিত্র ১: সরকারের প্রধান দায়বদ্ধতা ও মৎস্য দপ্তরের ভূমিকা

আগেই উল্লেখিত হয়েছে, দেশের অন্যান্য বেশ কয়েকটি রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে মাছ চাষ ও আহরনের ক্ষেত্র কম হওয়া সত্ত্বেও সারা দেশের মধ্যে মৎস্য বীজ উৎপাদনে এই রাজ্য প্রথম আর মোট মাছ উৎপাদনের দ্বিতীয় (বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ টন)। প্রায় ২৯.৫০ লক্ষ মানুষ এই ক্ষেত্রের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যুক্ত। আর রাজ্যের গড় সমগ্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে মৎস্যচাষ, কৃষি ও তার সহযোগী ক্ষেত্রগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। রাজ্যের গড় সমগ্র উৎপাদনে মৎস্য চাষের অবদান ২.৪৪ শতাংশ। ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে মাছ ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি করে আমাদের রাজ্য প্রায় ১৮২৫ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। তবে রাজ্যের আভ্যন্তরীন বাজারে পোনা মাছের চাহিদা মেটাতে তুলনায় কম দামে কিছু (বছরে প্রায় ১.১৫ লক্ষ টন) মাছ অন্য রাজ্য থেকে আমদানি করতে হচ্ছে।

রাজ্যকে মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা, মাছ-প্রিয় বাঙালির পাতে প্রতিদিন ৭৫ গ্রাম মাছের যোগান দেওয়ার পাশাপাশি আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বাৎসরিক ৫০০০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার মতো লক্ষ্যগুলি পূরণের জন্য রাজ্যের মোট মৎস্য উৎপাদন বছরে প্রায় ২৫ লক্ষ টনে নিয়ে যেতে হবে আর সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবী, মৎস্য দপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রগুলির সম্মিলিত ও আন্তরিক প্রয়াস জরুরী। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, যেহেতু দেশের সংবিধান অনুসারে মাছ চাষের উন্নয়ন রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত তাই এই বিষয়ে গুরু দায়িত্ব রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তরকেই নিতে হবে এবং সময়ের চাহিদা অনুসারে সুনির্দিষ্ট আইন ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

যেহেতু সামুদ্রিক এলাকা থেকে রাজ্যে মৎস্য আহরণ ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ খুব কম তাই প্রায় ১০ লক্ষ টনের বর্দ্ধিত উৎপাদনের সিংহভাগ চাষের মাধ্যমেই আনতে হবে। সেক্ষেত্রে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি নিতে হবে তা চিত্র ২ এ উল্লেখ করা হল। প্রাথমিক লক্ষ্য, এখনো পড়ে থাকা জলাশয়গুলিকে বিজ্ঞান ভিত্তিক মাছের চাষে আনা। এই মুহূর্তে 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পে এম.জি.এন.আর.জি.এস এর আর্থিক সহায়তায় হাজা-মজা-পতিত জলাশয়গুলিকে সংস্কার করে অবিলম্বে মাছ চাষের আওতায় নিয়ে আসা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি, যে সকল জলাশয়ে ইতিমধ্যেই বাৎসরিক উৎপাদনশীলতা হেক্টর প্রতি ৫ টনে উন্নীত হয়েছে সেই সকল জলাশয়ে উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি বছরে ৭-১০ টনের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে নতুন উদ্যমে ঝাঁপাতে হবে।

বর্তমান সময়ে গ্রামীণ বাংলার একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, ধান চাষে তেমন কোনো লাভ না থাকায় জমি কেটে পুকুর তৈরী করে মাছচাষ করা। এতে আক্ষরিক অর্থে সব দিক থেকে উপকার হলেও আইনি জটিলতা রয়েছে। জমিকে পুকুরে পরিণত করার আগে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কাছ থেকে রূপান্তর করানো জরুরী। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে এই প্রক্রিয়াটি অনেক বেশী সময় নিচ্ছে এবং রূপান্তরের জন্য সরকার নির্দিষ্ট খরচ নিয়েও বিভ্রান্তি তৈরী হচ্ছে। ফলে অনেকেরই নতুন পুকুর তৈরী করে মাছ চাষ শুরু করার ইচ্ছা থাকলেও আইনি জটিলতার ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছেন। এই অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়টি নিয়ে মৎস্য দপ্তর ও ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের যৌথ উদ্যোগ আশু প্রয়োজন।

এর পাশাপাশি জলাভূমি ভরাট, চাষ না করে পুকুর ফেলে রাখা, নোংরা-আবর্জনা ফেলে পুকুরকে দূষিত করা, অন্যের পুকুরে বিষ দেওয়ার মতো সামাজিক ব্যাধিগুলিকে

'পশ্চিমবঙ্গ অন্তর্দেশীয় মৎস্য চাষ আইন ১৯৮৪' কঠোরভাবে প্রয়োগ করে নির্মূল করাও খুবই জরুরী। বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কৃত প্রযুক্তিগুলিকে মাছচাষিদের কাছে পৌঁছে দিতে মৎস্য দপ্তরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। বিভিন্ন মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রগুলির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন ও তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফলকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে চাষীর খামারে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয় সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে মাছচাষীদের উৎসাহিত করা একান্ত আবশ্যিক।

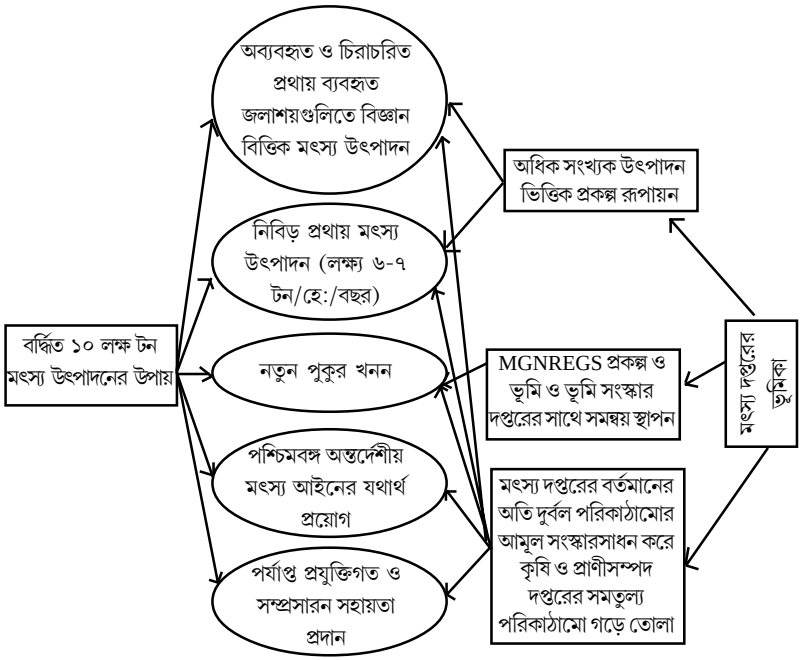

চিত্র ২: মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও মৎস্য দপ্তরের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গে মাছ চাষের বর্তমান সমস্যা

১. মৎস্য দপ্তরের সম্প্রসারণ পরিকাঠামো ঃ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের হলেও সত্যি যে, পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য দপ্তর ১৯১১ সালে গঠিত হলেও দপ্তরের বহুবিধ উন্নয়নমূলক ও জনকল্যাণকর প্রকল্পগুলির তৃণমূল স্তরে সঠিক রূপায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ পরিকাঠামো আজ অবধি গড়ে ওঠেনি। মৎস্য দপ্তরের বর্তমান পরিকাঠামোয় ব্লক পর্যায়ের দপ্তরের সকল প্রকার উন্নয়নমূলক ও সামাজিক কার্যগুলির রূপায়নের দায়িত্ব পালন করেন মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক। তাকে সহযোগিতা করার জন্য রয়েছেন

ফিসারী ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট (FFA) ও ফিসারমেনস অ্যাটেন্ড্যান্ট (FA)। কিন্তু অত্যন্ত দুভার্গ্যের বিষয় এই যে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে দপ্তরের কোন প্রতিনিধিত্ব না থাকায় দপ্তরে বহুবিধ কর্মকান্ডের রূপায়ন ও নজরদারী বহুলাংশে ব্যবহৃত হয়।

২. ব্যাঙ্ক ও বীমা ঃ মাছের চাষে মূলধন অন্যান্য অনেক চাষের তুলনায় অনেকটাই বেশী লাগে। গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক ও গরীব মাছচাষীর পক্ষে প্রয়োজনমতো মূলধনের যোগান দেওয়া কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। লক্ষ্যণীয় বিষয়, মাছ চাষ অত্যন্ত লাভজনক চাষ মেনে নিয়েও ব্যাঙ্কগুলি মাছের চাষে ঋণ দেওয়ার বিষয়ে অনীহা প্রকাশ করে। মাছের চাষে দেশে সুনির্দিষ্ট কোন বীমা পলিসি না থাকা এই অনিহার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ফলে চাষীরা বাধ্য হয়ে এলাকার মহাজনদের কাছে চড়া সুদে ঋণ নেন এবং ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েন। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অনতিবিলম্বে নজর দেওয়া জরুরী।

৩. মাছ চাষ ও মাছচাষির সামাজিক সুরক্ষা ঃ মাছ চাষ ও মাছচাষিদের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি সারা দেশে এবং এই রাজ্যেও সম্পূর্ণ অবহেলিত। প্রচুর অর্থ ব্যয় করার পরেও লাভের গুড় পিপড়ায় খেয়ে যাবে কিনা সেই ভয়ে মাছচাষিরা সিঁটিয়ে থাকেন। কে কখন পুকুরে বিষ ঢেলে চলে যাবে, রাতের অন্ধকারে কেউ আবার ফাঁস জাল বসিয়ে মাছ ধরে নিয়ে চলে গেল কিনা ইত্যাদির ভয়ে চাষিরা আতঙ্কিত। মাছ চাষের অগ্রগতির ক্ষেত্রে মাছচাষিদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের বিষয়টি সরকারকে যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে কতকগুলি সুপারিশ ঃ

❍ দপ্তরের ক্রমবর্দ্ধমান কর্মকান্ডের দ্রুত ও যথার্থ রূপায়ন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে উপযুক্ত নজরদারীর জন্য রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে কৃষি ও প্রাণী সম্পদ দপ্তরের ন্যায় একটি করে **মৎস্য প্রযুক্তি সহায়ক (সরকারি স্থায়ী পদ)** ও একটি করে **মৎস্য বন্ধু (চুক্তি ভিত্তিক)** পদ তৈরী আশু প্রয়োজন।

❍ প্রতিটি ব্লকে কমপক্ষে একটি করে অ্যাকোয়া সপ স্থাপন।

❍ প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি করে মাছের খাবার তৈরীর কারখানা স্থাপন।

আরো বেশী পরিমাণ মাছ চাষের উপর বাংলা বই, পি.এইচ পেপার, চুন, মাছের চারা, খাবার, জাল (খ্যাপলা ও টানা), হাঁড়ি, তাপ নিরোধক মাছ রাখার বাক্স, পাল্লা-বাটখারা ইত্যাদি বিতরণ।

❍ মাছের বিবিধ রোগ নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা।

❍ কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সমতুল ফিসারমেন ক্রেডিট কার্ড চালু করা।

❍ সরকারি ছাড় সহ এয়ারেটার বা পাম্পসেট সহযোগে অর্দ্ধ-ঘন ও ঘন মাছ চাষের প্রকল্প রূপায়ন।

❍ বিভিন্ন প্রকার উন্নত বিজ্ঞান সম্মত মাছ চাষের উপর প্রদর্শনীক্ষেত্র পরিচালন।

❍ মাছের কাজে নিয়োজিত সকল স্তরের মানুষকে যথোপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা প্রদান।

❍ মাছ চাষের বিভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

❍ রাজ্যের প্রতিটি মৎস্য হ্যাচারি ও মৎস্য আড়তের জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা ও দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে আনা।

❍ যে সকল ব্লকগুলিতে এখনো মৎস্য দপ্তরের ল্যাবরেটরি কাম ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হয়নি সেখানে অতি দ্রুত এটির ব্যবস্থা করা।

❍ ব্লক ও জেলা পর্যায়ে মাছের রোগ নির্ণয়ের জন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টার স্থাপন।

❍ রাজ্যে একটি স্বতন্ত্র মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন।

উপসংহার ঃ 'মাছ চাষ আর এ.টি.এম কার্ড রাখা একই রকম-ইচ্ছে মতো টাকা তোলা যায়' বার্তাটি রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। গ্রামীণ বাংলায় কর্মসংস্থানের মতো অতি সংবেদনশীল প্রশ্নে মৎস্য ক্ষেত্র যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছে সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা একমত। মৎস্যক্ষেত্র উন্নয়নের এইরূপ অনুকূল পরিবেশে রাজ্যের মৎস্য দপ্তরকে দায়িত্বশীল অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। আশার কথা, রাজ্যের মৎস্যক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ার গঠিত **'স্পেশাল টাস্ক ফোর্স অন ফিসারীজ'** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী সুপারিশ পেশ করেছেন। রাজ্যের মৎস্য দপ্তর এই সকল সুপারিশগুলি দ্রুত কার্যকর করার মধ্য দিয়ে এই ক্ষেত্রটিকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাবে সেই প্রত্যাশা রাখি।

বরোলী উৎসব, ২০১৫— একটি প্রতিবেদন

শুভেন্দু হালদার

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি বিশেষত কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও মনোরম পরিবেশ যেমন বারে বারে ভ্রমণ পিপাসুদের উত্তরবঙ্গে আসতে বাধ্য করে তেমনি এখানকার নিজস্ব বরোলী মাছ খাবারের পাতে বাঙালীর রসনা তৃপ্তির একটি আলাদা মাত্রা এনে দেয়। তাই উত্তরবঙ্গে বেড়াতে এসে যদি বরোলী মাছ চেখে দেখা না হয় তাহলে একটি স্বাদ অপূর্ণই রয়ে যায়।

উত্তরবঙ্গের সমস্ত নদীগুলিতে (তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, রায়ডাক ইত্যাদি) এই বরোলী মাছ পাওয়া গেলেও আলিপুরদুয়ার জেলার রায়ডাক নদীর ইউনিক প্রজাতি হল এই বরোলী মাছ, ঠিক যেমন *Labeo fimbriatus* হল গোদাবরী নদীর। বরোলী মাছ cypriniforms family-এর অন্তর্ভুক্ত একটি মাইনর কার্প। মোট ছয় রকমের বরোলী মাছ পাওয়া যায়। (১) *Barilius bendelisis* (২) *B. dogarsinghi* (৩) *B. tileo* (৪) *B. shacra* (৫) *B. barna* (৬) *B. negra*। বরোলী মাছ খুব বেশি বড় হয় না। এদের গায়ের রং রূপোলী। এরা জলের উপরিতল এবং মাঝের স্তরে বসবাস করে। এরা সাধারণত বিভিন্ন ধরনের প্রানীকণা, কীটপতঙ্গ এবং বালুকণা খাবার হিসাবে গ্রহণ করে। এই মাছ মূলত সারাবছর ধরে পাওয়া যায় কিন্তু মার্চ থেকে আগষ্ট মাস সময়ে এদের আধিক্য দেখা যায়। এরা জঙ্গল লাগোয়া হালকা স্রোত যুক্ত জলে প্রজনন করে। প্রজনন কালে পুরুষ বরোলী মাছের রং উজ্জল হয় এবং এর সোনালী-হলুদ রং এর কানকো দেখা যায়। স্ত্রী বরোলী মাছ কম উজ্জ্বল এবং আকারে পুরুষ বরোলী থেকে বড়ো হয়। একটি পরিনত বরোলী মাছ ৩০০০-৫০০০ ডিম দেয়। এদের প্রজনন কাল অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে বিভিন্ন কারনে আজ বরোলী সহ অন্যান্য স্থানীয় দেশীয় মাছ যেমন কুর্শা, চেলা, বাশপাতা, কাজলী, বাতাসী, চাপিলা, কোকসা অবলুপ্তির পথে। চাবাগান ও কৃষি জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক নদীর জলে মিশে জলকে দূষিত করছে যার ফলস্বরূপ বরোলী মাছ সহ অন্যান্য মাছের প্রজনন ব্যহত হচ্ছে। এছাড়া আজকাল ইলেকট্রিক ও ডিনামাইট দিয়ে মাছ ধরার প্রবনতা বাড়ছে। যার প্রভাবও পড়ছে এই সমস্ত মাছের হারিয়ে যাওয়ায়। আরও একটি বিষয় না বললেই নয় সেটা হল মৎস্যজীবীদের বারে বারে সচেতন করা সত্বেও যথেচ্ছ পরিমানে মশারীর জালের ব্যবহার। যার ফল স্বরূপ ছোট ছোট মাছগুলি বিনষ্ট হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের দেশীয় মাছ বরোলী

বরোলী উৎসবের মঞ্চে মাননীয় মৎস্য মন্ত্রী শ্রী চন্দ্রনাথ সিন্‌হা

বরোলী সহ অন্যান্য মাছ যেমন চাপিলা, বাতাসী, কুর্শা, কাজলী হল উত্তরবঙ্গের গর্ব এবং অমূল্য সম্পদ। একে রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সকলের। এই দায়িত্বের কথা মাথায় রেখেই সকলকে এর মধ্যে সামিল করে এই সমস্ত জনপ্রিয় মাছগুলিকে সংরক্ষণ ও প্রসারের লক্ষ্যে গত ২১ ও ২২ শে মে ২০১৫ তারিখে কোচবিহার মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে দুই দিন ধরে একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। যার নাম 'বরোলী উৎসব ২০১৫'। অনুষ্ঠানের নাম বরোলী উৎসব হলেও সেখানে আলোচনার বিষয় ছিল বরোলী সহ অন্যান্য স্থানীয় মাছের সংরক্ষণ ও প্রসার। এবং এই সমস্ত মাছ নিয়ে জনসাধারনের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো। এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন প. ব. সরকারের মাননীয় মৎস্য মন্ত্রী শ্রী চন্দ্রনাথ সিন্‌হা, জেলাশাসক পি উলগানাথন, সভাধিপতি শ্রীমতি পুষ্পিতা রায় ডাকুয়া, বিধায়ক শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন মৎস্য দফতরের অতিরিক্ত অধিকর্তা শ্রী ফনিং লেপচা, যুগ্ম অধিকর্তা শ্রী শৈলেন বিশ্বাস, উপ অধিকর্তা (উ: ব: জোন) শ্রী উত্তম পাঁজা, সহ মৎস্য অধিকর্তা শ্রী ড: অলোকনাথ প্রহরাজ সহ কোচবিহার মৎস্য দফতরের সমস্ত ব্লকস্তরের আধিকারিকগণ। এছাড়াও কোচবিহার জেলার সমস্ত ব্লকের প্রচুর মৎস্য চাষি ও মৎস্যজীবীরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বরোলী মাছ যেহেতু পুরোপুরি একটি নদীর মাছ সেহেতু মাছটিকে পুকুর অথবা ট্যাঙ্কে কী ভাবে চাষ করা যায়, সেটাই ছিল এই অনুষ্ঠানের মুখ্য আলোচনা। এই সমস্ত মাছ সর্ম্পকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট মৎস্য চাষিরা তাদের নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা এখানে তুলে ধরেন। এটাই ছিল উৎসবের প্রথম দিনের আলোচনা। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে ছিল বিভিন্ন উদ্যোক্তা ও মৎস্য চাষিদের মাছ চাষে উত্তরবঙ্গে বিনিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনা। এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে ছিলেন Nexgen Feed (King fish), SNCADA (কোচবিহার সাগর দিঘী উন্নয়নকারী সংস্থা), কোচবিহার ফিস সিড প্রডিউসার অর্গানাইজেশন, EVIANA incorportation এবং Aisharya Aquaculture Pvt. Ltd। এর মধ্যে উৎসবের সহযোগিতায় ছিল SNCADA এবং কোচবিহার ফিস সিড প্রডিউসার অর্গানাইজেশন।

এছাড়া উৎসবের বিশেষ আকর্ষন ছিল কোচবিহার ক্যালকাটা ক্যাটারের তরফ থেকে বরোলি মাছ সহ অন্যান্য মাছের রকমারী রান্না চেখে দেখার স্বাদ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তরের বিশেষ টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ সমূহ-একটি প্রতিবেদন

রবীন্দ্রনাথ কুণ্ডু

ধন-ধান্য-পুষ্পে ও মৎস্যে ভরা আমাদের এই সোনার বাংলা। মাছে-ভাতে বাঙালীর এই বাংলায় মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্য্য সর্বজনবিদিত। এহেন বাংলা বিগত শতকের শেষ দশক ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম কয়েক বছর মৎস্য উৎপাদনে ভারতে প্রথম স্থান দখল করে। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে লক্ষণীয় ভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার ধারে কাছে পৌঁছাতে পারিনি আমরা। পিছিয়ে পড়েছি অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাত, তামিলনাড়ু এর মতো রাজ্যগুলির থেকে।

আমাদের প্রিয় সংগঠন 'ওয়েষ্ট বেঙ্গল প্রফেশনাল ফিসারীজ গ্র্যাজুয়েট্‌স অ্যাসোসিয়েশন'—এর প্রতিটি সদস্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছ মৎস্য বিজ্ঞানের ঐ দীক্ষা। প্রতিটি মুহূর্তে আমরা চাইছিলাম এই অপেশাদারী মনোভাবের পরিবর্তন। সেই লক্ষ্যে সাংগঠনিক স্তরে বারংবার স্মারকলিপি দেওয়া হয় মৎস্য অধিকর্তা ও তদানীন্তন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে। আলোচনা করা হয় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি উপদেষ্টা মহাশয়ের সাথে। আমাদের কাছে আশার আলো ছিল সরকারের প্রাণোচ্ছ্বলতা, নতুন কিছু করার মানসিকতা ও উন্নয়নের চিন্তাধারা।

অবশেষে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন মৎস্য দপ্তরে স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের। (সরকারী আদেশনামা সংখ্যা ৬ (৭) ক্যাবিনেট সেক্রেটারী/টাস্ক ফোর্স, তারিখ ১১.০৪.২০১৩)। এই উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠিত হয় মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মনিশ গুপ্তের সভাপতিত্বে। অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক, কৃষি দপ্তর; মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর, শ্রী সৌমেন মহাপাত্র; মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ রায়, কৃষিজ বিপণন; মাননীয় মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জী, সেচ ও জলপথ দপ্তর ও সর্বোপরি মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা ও মুখ্যসচিব সঞ্জয় মিত্র মহাশয়। পথ চলা শুরু হয় বিশেষ টাস্ক ফোর্সের, আশায় বুক বাঁধা শুরু হয়।

অতি সম্প্রতি জমা পড়েছে এই টাস্ক ফোর্সের প্রতিবেদন, যার প্রতিটি ছত্রে ছত্রে রয়েছে মৎস্য দপ্তরকে দীর্ঘদিন প্রযুক্তিহীন করে রাখার চিত্র, রয়েছে দপ্তরের অন্দরের ফাঁকফোকরগুলি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো, করা হয়েছে ভবিষ্যতের উন্নতির দিকে পথনির্দেশ। চাহিদা ও যোগানের এই বিস্তর ফারাকের দিকে নজর রেখে টাস্কফোর্স তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে তিন ধরনের সুপারিশ সমূহ।

১। আশু ও অত্যাবশকীয় (Immediate) পরিকল্পনা সমূহ।

২। স্বল্পকালীন (short term) পরিকল্পনা সমূহ।

৩। দীর্ঘকালীন (long term) পরিকল্পনা সমূহ।

১. আশু ও অত্যাবশকীয় (Immediate) পরিকল্পনা সমূহ ঃ

১.১. টাস্ক ফোর্সের সুপারিশগুলির মধ্যে প্রথমেই আছে পঞ্চায়েত, পৌরসভা/পৌরনিগম, অন্যান্য সরকারী দপ্তর ও আধা সরকারী সংস্থার অধীনে থাকা সকল জলাশয়কে মাছ চাষের আওতায় আনতে হবে। ও তার থেকে উৎপাদিত মৎস্য বাজারজাত করতে হবে।

১.২. কলকাতার মতো রাজ্যের সব জেলার প্রধান বাজারগুলিতে 'নিয়ন্ত্রিত মূল্যে' মাছ বিক্রির উদ্যোগ নিতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ স্বল্পমূল্যে মাছ কিনতে পারেন ও বাজারে মাছের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকে।

১.৩. GIS ম্যাপিং এর মাধ্যমে সকল জলাশয়ের তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে। এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে।

১.৪. পরিকল্পনা গ্রহণ, পর্যালোচনা ও রূপায়ণের লক্ষে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন 'রাজ্য মৎস্য আয়োগ' গঠন করতে হবে। রাজ্যস্তরে এটিই হবে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণ কমিটি।

১.৫. রাজ্যের অগুনতি বিল ও জলাধারগুলির উন্নয়নের জন্য দুটি পৃথক সেল গঠন করতে হবে।

১.৬. সময়ের সাথে সাথে আমাদের নিজস্ব দেশীয় কুঁচো মাছগুলি হারিয়ে যাচ্ছে। যদিও সারা রাজ্যে এগুলির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। এই দেশীয় কুঁচো মাছগুলিকে মানুষের পাতে ফিরিয়ে দেবার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

১.৭. জলাশয়গুলির লিজ সময়কাল ৩ বছর থেকে বাড়িয়ে ৭ বছর করতে হবে। ৩ বছর সময়কালের মধ্যে ঋণ নির্ভর প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চাষীদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ফলে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির অবদান মৎস্য উৎপাদনে নগণ্য হয়ে পড়ছে।

১.৮. 'কেন্দ্রীয় তথ্য ভাণ্ডার' গঠন করতে হবে। ও সেই তথ্য মৎস্য উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির কাছে টেলিভিশন, রেডিও, মেসেজিং সার্ভিস, ওয়েবসাইট ও অন্যান্য মাধ্যমে পৌঁছে দিতে হবে।

১.৯. মাছের পোনা উৎপাদন ও মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে হ্যাচারী, ফার্ম ও সকল মাছচাষীকে কৃষি দপ্তরের ন্যায় ভর্তুকি মূল্যে বিদ্যুৎ দিতে হবে।

১.১০. সরকারী মৎস্য খামারগুলিতে জেনেটিক্যালি ইমপ্রুভড ফার্মড তিলাপিয়া

(GIFT) ও অন্যান্য বিদেশী দ্রুত উৎপাদনশীল চাষ করে অন্যান্য চাষীদের অনুপ্রাণিত করতে হবে।

১.১১. GTA অন্তর্ভুক্ত এলাকায় ট্রাউট ফার্ম তৈরী করে ঝোড়া ফিসারীর উন্নতির চেষ্টা করতে হবে।

১.১২. MGNREGA ও 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পে খনন করা বা সংস্কার করা জলাশয়গুলিকে মাছ চাষের আওতায় আনতে হবে। জলাশয়গুলিতে সারা বছর জল না থাকলে সেগুলিতে দেশীয় কুঁচো মাছ ও জিওল মাছ চাষের উদ্যোগ নিতে হবে।

১.১৩. ৫০০ গ্রামের কম ওজনে ইলিশ মাছ ধরা, পরিবহন, বাজারজাতকরন ও বিক্রি বন্ধ করতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারীদের জরিমানা সহ শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ইলিশের দাম আয়ত্ত্বের মধ্যে রাখতে বাংলাদেশ, মায়ানমার, মহারাষ্ট্র ও গুজরাত থেকে মাছ আমদানীর ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। রাজ্যস্তরে ইলিশ সংরক্ষণ কেন্দ্র ও গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

১.১৪. পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য চারা উৎপাদনে প্রথম সারির রাজ্য, এই ক্ষেত্রটির আরও উন্নতি করতে হবে। মৎস্য দপ্তরকে প্রতিটি ব্লকে চারা তৈরীর হ্যাচারী সরকারী ভাবে অথবা যৌথভাবে গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান সময়ের হ্যাচারীগুলিকে যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নত করে তুলতে হবে।

১.১৫. মৎস্য জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'মনোফিলামেন্ট জাল, ১২ মিমি'র কম ফাঁসযুক্ত জাল ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। ক্রুপ হলিডে ও ব্যান পিরিওডে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করতে হবে।

১.১৬. উক্ত সকল বিষয় পর্যালোচনা করার জন্য রাজ্যস্তরে মৎস্য দপ্তরের প্রধান সচিব এবং কৃষি, জলসেচ ও জলপথ পরিবহন, কৃষিজ বিপনন, জল সম্পদ দপ্তরের বিভাগীয় সচিবদের সাথে নিয়ে একটি উচ্চস্তরের 'Monitoring committee' গঠন করতে হবে। এই কমিটি ১৫ দিন অন্তর সমস্ত দিকগুলি খতিয়ে দেখবে ও পরবর্তী দিক নির্দেশ করবে।

২. স্বল্পকালীন (Short term) পরিকল্পনা সমূহ ঃ—

২.১. পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য চারা উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে যথাযথ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, বীজ শংসাপত্রের অপ্রতুলতা, ইনব্রিডিং ইত্যাদি কারণে। Seed certification এর জন্য যথাযথ পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে ও হ্যাচারীগুলিতে নজরদারী চালাতে হবে।

২.২. প্রতিটি ব্লকে একটি করে 'বীজ গ্রাম' (Seed Village) গড়ে তুলতে হবে,

যেখান থেকে প্রতিটি ব্লকে উন্নত চারার যোগান সম্ভব হবে।

২.৩. এই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার সরকারী মৎস্য খামার ও মৎস্য চারা খামার বা হ্যাচারীগুলি সংস্কার করে পুনরায় চালু করতে হবে।

২.৪. রাজ্যের অসংখ্য বিল-বাওড়গুলিতে দেশী প্রজাতির ও কুঁচো মাছ মজুত করতে হবে। এই জলাশয়গুলিকে Bio-reserve হিসাবে গণ্য করতে হবে।

২.৫. রাজ্যে রঙিন মাছের সম্ভাবনাময় জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করে সেখানে হ্যাচারী, বাজার প্রভৃতি পরিকাঠামো গঠন করতে হবে। এই ক্ষেত্রটি রাজ্যে বেকার যুবক যুবতীদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারে।

২.৬. মজে যাওয়া বা মাছ চাষের অনুপযুক্ত হয়ে পড়া জলাশয়গুলি MGNREGA প্রকল্পের আওতায় সংস্কারের মাধ্যমে মাছ চাষের কাজে যুক্ত করতে হবে।

২.৭. হুগলি, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমানের মতো জেলাগুলিতে প্রগতিশীল মাছ চাষীদের বড় জলাশয়গুলিতে বড় মাছ চাষে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

২.৮. উচ্চ ফলনশীল মাছ যেমন পাঙ্গাস, মনোসেক্স তিলাপিয়া চাষের ওপর জোর দিতে হবে। অন্যান্য কার্প জাতীয় মাছের সাথে বা এককভাবে চাষের ব্যাপারে চাষীদের উৎসাহিত করতে হবে। সারা দেশে এগুলির ভালো চাহিদা রয়েছে।

২.৯. রাজ্যে অধিকাংশ জায়গায় মাছ চাষ এখনও প্রচলিত পদ্ধতিতে হয়ে থাকে, ফলে উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। মাছ চাষের ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ ব্যয় হয় পরিপূরক খাবার জোগাতে, এক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি। এ ব্যাপারে মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগী হয়ে NFDB-এর সহযোগীতায় খাবার তৈরীর কারখানা গড়ে তুলতে হবে। ও ভর্তুকি মূল্যে চাষীদের খাবার সরবরাহ করতে হবে।

২.১০. সমুদ্রে মাছ ধরার ক্ষেত্রে তীরবর্তী অঞ্চলগুলি অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে মাছের সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। এক্ষেত্রে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার নৌকা ব্যবহারে গুরুত্ব দিতে হবে ও উৎপাদন বাড়াতে হবে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার থেকে বাঁচতে প্রতিটি নৌকায় Disaster Alert Transmitter দিতে হবে।

২.১২. মৎস্য বীমা ক্ষেত্রে কয়েকটি সংস্থা এগিয়ে এলেও বিষ প্রয়োগে বা বন্যায় ক্ষতির ক্ষেত্রে কোন যথাযথ ক্ষতিপূরণের জায়গা থাকছে না। এই ক্ষেত্রটিতে বেশী করে নজর দিতে হবে। অতি সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার এ ব্যাপারে তাদের নীতি সংশোধন করেছে। এ রাজ্যেও তার প্রয়োজন রয়েছে।

২.১২. তথ্য অনুযায়ী সারা রাজ্যে প্রায় ৩ লক্ষ্য পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মাছ চাষের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু তারা কোন প্রকার জীবনবীমা বা স্বাস্থ্য বীমার আওতায় নেই। কৃষিজ ক্ষেত্রের মতো মৎস্য চাষের ক্ষেত্রেও মৎস্যজীবি সুরক্ষা যোজনা বা আম

আদমি বীমা যোজনা চালু করা যেতে পারে। স্বাস্থ্যবীমার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা যোজনার ন্যায় সামাজিক প্রকল্প চালু করা যেতে পারে।

২.১৩. স্বল্পকালীন ঋণের ক্ষেত্রে KCC এর ন্যায় মৎস্যজীবী ঋণপত্র চালু করা যেতে পারে। যা প্রান্তিক চাষীদের মহাজনের হাত থেকে বাঁচতে পারে।

২.১৪. প্রতিটি জেলায় পরীক্ষাগার বাধ্যতামূলক করতে হবে। যেখানে খাবার, ওষুধ, প্রোবায়োটিক, স্যানিটাইজার ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পুকুরে ব্যবহারের আগে পরিক্ষা করা যাবে।

২.১৫. গবেষণা উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। রাজ্যের গবেষণা কেন্দ্রগুলি তাদের জৌলুষ হারিয়েছে। সেগুলিকে আধুনিকিকরণ, লোকবল ও অর্থনৈতিক সাহায্যের মাধ্যমে পুনরায় চালু করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক সহায়তা NFDB থেকে পাওয়া যেতে পারে। রাজ্যের অন্যান্য মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র যেমন CIFR, CIBA, WBUAFS এর সাথে আরো নীবিড় সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

২.১৬. গ্রামাঞ্চলে মৎস্য উৎপাদনে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলিতে 'ফিস ক্লিনিক' বা 'অ্যাকোয়া শপ্' গড়ে তুলতে হবে। ক্লিনিকগুলিতে প্রাথমিকভাবে জল-মাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা, মাছের খাবার, ওষুধ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ক্লিনিকগুলিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার যুবকদের স্বাবলম্বী করে তোলা যেতে পারে। যারা প্রাণীসম্পদ দপ্তরের প্রাণীবন্ধু বা প্রাণী মিত্রার ন্যায় মৎস্য বন্ধু হিসাবে পরিচিত হবেন।

৩. দীর্ঘকালীন (Long term) পরিকল্পনা সমূহ ঃ-

৩.১. সেচ দপ্তরের মাধ্যমে তাদের জলপথ ও জলাধারগুলিকে কয়েক বছরের পরিকল্পনার মাধ্যমে সংস্কার করে পুনরায় মাছ চাষের উপযুক্ত করে তোলা যেতে পারে।

৩.২. বর্তমানে জলাধারগুলির উৎপাদন ২০ কেজি/হেঃ/বছর-এ আটকে আছে। পেন ও কেজ পদ্ধতিতে চাষের মাধ্যমে এই উৎপাদন বৃদ্ধি করে ১০০ কেজি/হেঃ/বছর করা সম্ভব।

৩.৩. দার্জিলিং জেলার লিজ পলিসিতে পরিবর্তন করে হারিয়ে যাওয়া দেশী মাছগুলিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। বিভিন্ন ঝোড়া বা নদীতে পর্যটনের সাথে স্পোর্টস ফিশিং চালু করতে হবে।

৩.৪. ট্রাউট খামারের সংখ্যা বাড়িয়ে উৎপাদন বাড়াতে হবে। মিরিকে ট্রাউট হ্যাচারী স্থাপন করে এ ব্যাপারে চাষীদের উদ্যোগ বাড়াতে হবে।

৩.৫. রাজ্যের খুটি, মৎস্য বন্দরগুলিতে মৌলিক ন্যূনতম সুবিধা যেমন পরিশ্রুত খাবার জল, শৌচালয়, বরফের প্রয়োজনীয় যোগান অনুপস্থিত। এ ব্যাপারে দৃষ্টিপাত

করা প্রয়োজন। আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে NFDB কাছে যাওয়া যেতে পারে।

৩.৬. দীঘা মোহনার বন্দরটিতে আধুনিকিকরণ অবশ্য প্রয়োজন। আধুনিক প্রসেসিং সেন্টার, প্রযুক্তি, হিমঘর, বরফকল প্রয়োজন।

৩.৭. বৈজ্ঞানিকদের সহযোগীতায় ইলিশের প্রজনন ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রজাতির সংরক্ষণের ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে।

৩.৮. মৎস্য দপ্তরে ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিগত লোকবলের যোগানের জন্য বর্তমানে বিদ্যমান ফিশারী ফ্যাকাল্টির সাথে নতুন একটি মৎস্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে জুনপুটে। যার দ্বিতীয় ক্যাম্পাস হবে মাথাভাঙ্গায়।

৩.৯. প্রকৃতিতে মৎস্য জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য নদনদীগুলিতে মৎস্য চারা ছাড়তে হবে। যাতে প্রকৃতিতে মাছের যোগান বজায় থাকে।

৩.১০. সামুদ্রিক মৎস্য বন্দর সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে মৎস্য সংরক্ষণের জন্য হিমঘর তৈরী করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রাইভেট সংস্থাগুলিকে সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

৩.১১. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহারের জন্য বিদ্যমান জোনগুলির সাথে একটি নতুন জোন গঠন করা যেতে পারে। যার নাম হবে 'কোস্টাল জোন'। যার হেড কোয়ার্টার হবে ডায়মন্ডহারবার।

৩.১২. কিন্তু এই বিপুল কর্মযজ্ঞের জন্য উপযুক্ত, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধিকারিক ও কর্মী দরকার। বিগত ৩০ বছর মৎস্য দপ্তরে কোন গঠনগত সংস্কার হয়নি। এই মুহূর্তে সমগ্র দপ্তরের মোট পদের চল্লিশ শতাংশ পদ খালি, সেটিও দপ্তরের তৃণমূল স্তরের পদগুলিতে। যা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব ফেলছে উৎপাদন ও পর্যবেক্ষণে। এই ব্যাপারে, অতি সত্বর সিদ্ধান্ত নিয়ে পদগুলি পূরণে সচেষ্ট হতে হবে।

৩.১৩. কৃষি ও প্রাণীসম্পদ দপ্তরের আধিকারিক ও মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক, মূলত মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকরা সমতুল শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ও তাদের পেশাগত দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্যও সমতুল। কিন্তু মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকরা অন্য দুই দপ্তরের থেকে যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে পদমর্যাদা ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে। যা প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত নতুন যোগ দেওয়া আধিকারিকদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করছে। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে দ প্তরের সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে।

টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ হল আধিকারিকদের পদমর্যাদা পুনঃ বিবেচনা করে, তাদের পদোন্নতির পথ প্রশস্থ করে ও বেতনক্রম পুনঃবিন্যাসের মাধ্যমে দপ্তরের আধিকারিকদের পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। প্রয়োজনে আধিকারিকদের পদটি সম্প্রসারণ আধিকারিক থেকে উন্নয়ন আধিকারিক করা যেতে পারে।

৩.১৪. মৎস্য দপ্তরের পুনঃবিন্যাসের লক্ষ্যে ব্লকস্তরে মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকদের

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের ছত্রছায়া থেকে বের করে পৃথক করণ গড়ে তুলতে হবে। অন্যথায় আধিকারিকরা ব্লকের অন্যান্য কাজে যুক্ত হতে বাধ্য হওয়ায় মৎস্য উৎপাদন ও ক্রিয়াকর্মে পূর্ণ সময়ের জন্য ন্যস্ত হতে পারছেন না। প্রতিটি ব্লকে মৎস্য উন্নয়ন আধিকারিকের করণে একজন ফিশারী ফিল্ড অ্যাসিস্টেন্ট ও প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে একজন মৎস্য বন্ধু (Self employment) নিয়োগ করতে হবে। সমস্ত আধিকারিক ও কর্মীকে মৎস্য অধিকারের এক ছাতার তলায় আনতে হবে। কৃষি ও প্রাণীসম্পদ দপ্তরের ন্যায় মৎস্য অধিকারকে (Fisheries Directorate) প্রযুক্তিগত (tech) ঘোষণা করতে হবে।

আজ এই ক্ষুদ্র পরিসরের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সুপারিশ তুলে ধরলাম পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যপ্রিয় ও মৎস্য চাষের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত মানুষজনের কাছে। এই সুপারিশসমূহ আমাদের মতো মৎস্য চিন্তনে চিন্তিত প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত আধিকারিকদের কাজে যেন সাজানো বাগানের ন্যায়। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য এই সুপারিশ মোতাবেক মৎস্য দপ্তর অতি দ্রুততার সাথে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা সাধুবাদ যোগ্য। এখনও অনেক পথ চলা বাকি, আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলির বাস্তবায়নের।

সর্বশেষে ধন্যবাদ ও আন্তরিক শ্রদ্ধা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে তার এই অত্যাবশ্যকীয় ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের জন্য। ধন্যবাদ টাস্ক ফোর্সের সকল সদস্যগণকে তাদের সুচারু বিশ্লেষণ ও গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ সমূহের জন্য।

আশা, গতানুগতিক প্রযুক্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক উন্নয়নের থেকে মুক্ত হয়ে আগামীতে আবার মৎস্য উৎপাদনে দেশে শীর্ষ আসন লাভ করবে এই রাজ্য।